১

ভূমিকা

ইতিহাস ও ভূগোলের রয়েছে অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক। মানুষের সকল কর্মকান্ডই সংঘটিত হয় ভৌগোলিক পরিমন্ডলে। ভৌগোলিক পরিবেশ প্রভাবিত করে ইতিহাসের ধারাকে। এই ইউনিটে ভারতীয় উপমহাদেশের ভৌগোলিক অবস্থান ও বৈশিষ্ট্যাবলী এবং উপমহাদেশের ইতিহাসে এসব বৈশিষ্ট্যের প্রভাব আলোচনা করা হয়েছে। পৃথকভাবে 'বাংলা' অঞ্চলের ভূ-প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্যগুলো চিহ্নিত করে বাংলার ইতিহাসে এদের প্রভাব নিয়ে আলোচনা স্থান পেয়েছে প্রথম পাঠে।

ইতিহাস উৎসের ওপর নির্ভরশীল। যেসব উৎসের ভিত্তিতে প্রাচীন ও সুলতানি যুগে ভারতীয় উপমহাদেশের ইতিহাস পুনর্গঠন করা হয়েছে তার আলোচনা রয়েছে যথাক্রমে দ্বিতীয় ও তৃতীয় পাঠে।

একই সময়কালে বাংলার ইতিহাসের উৎসসমূহ নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে চতুর্থ পাঠে।

ইতিহাস পাঠে উৎসের গুরুত্ব সম্পর্কে সম্যক ধারণা জন্মানোর জন্য উৎস সম্পর্কে আলোচনা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়।

এ ইউনিটের পাঠগুলো হচ্ছে ঃ

- পাঠ-১. ভৌগোলিক অবস্থান এবং ইতিহাসে এর প্রভাব
- পাঠ-২. প্রাচীন ভারতের ইতিহাসের উৎস
- পাঠ-৩. উপমহাদেশের মুসলিম যুগের ইতিহাসের উৎস (প্রাক্-মুঘল আমল)
- পাঠ-৪. বাংলার ইতিহাসের উৎস ঃ প্রাচীন ও সুলতানি যুগ।

পাঠ - ১

ভৌগোলিক অবস্থান এবং ইতিহাসে এর প্রভাব

উদ্দেশ্য

এই পাঠ পড়ে আপনি–

- *ভারতীয় উপমহাদেশের ভৌগোলিক অবস্থান ও বৈশিষ্ট্যসমূহ জানতে পারবেন ;*
- *ভারতীয় উপমহাদেশের মধ্যে 'বাংলা'র অবস্থান ও ভৌগোলিক পরিবেশ সম্পর্কে জানতে পারবেন ;*
- *ভারতীয় উপমহাদেশের ইতিহাসে ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্যাবলীর প্রভাব বুঝতে পারবেন ;*
- *ইতিহাসে ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্যাবলীর প্রভাব সম্পর্কে ধারণা করতে পারবেন।*

যেকোন দেশের রাজনৈতিক পরিবর্তন, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিবর্তন ভৌগোলিক অবস্থার ওপর নির্ভরশীল।

মানুষের সামগ্রিক কর্মকান্ড ও কীর্তিকলাপ এবং তার অবস্থান ও পরিবেশের মধ্যে এক অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক রয়েছে। যেহেতু মানুষের কর্মকান্ড এক বিশেষ ভৌগোলিক পরিবেশে সংঘটিত হয়, তাই ভূগোলই ইতিহাসের ভিত্তি। যেকোন দেশের রাজনৈতিক পরিবর্তন, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিবর্তন ভৌগোলিক অবস্থার ওপর নির্ভরশীল। একটি দেশের ভৌগোলিক অবস্থান, পাহাড়-পর্বত, নদ-নদী, জলবায়ু সামগ্রিকভাবে সেই দেশের জনগণের জীবনযাত্রা প্রণালী এবং রাজনৈতিক আশা-আকাঙ্ক্ষাকে প্রভাবিত করে।

ভারতীয় উপমহাদেশের ভৌগোলিক অবস্থান ও বৈশিষ্ট্যাবলী

নির্দিষ্ট প্রাকৃতিক সীমারেখা ভারতীয় উপমহাদেশকে এশিয়ার অন্যান্য অঞ্চল থেকে পৃথক করেছে।

ভারত এশিয়ার দক্ষিণভাগে একটি উপমহাদেশ। নির্দিষ্ট প্রাকৃতিক সীমারেখা ভারতীয় উপমহাদেশকে এশিয়ার অন্যান্য অঞ্চল থেকে পৃথক করেছে। এই উপমহাদেশের উত্তরে সুউচ্চ হিমালয় পর্বতমালা। হিমালয়ের পশ্চিম প্রান্ত থেকে ক্রমশ: দক্ষিণমুখী কারাকোরাম, হিন্দুকুশ ও ক্ষীরথর পর্বতমালা ভারতের পশ্চিম সীমান্তে সৃষ্টি করেছে এক অলঙ্ঘনীয় প্রাকৃতিক সীমারেখা। আর এই সীমারেখাই ভারতকে বিচ্ছিন্ন করেছে পশ্চিম এশিয়া থেকে। উত্তরের হিমালয় পর্বতশ্রেণী ভারত ও চীনের মধ্যেও সৃষ্টি করেছে অলঙ্ঘনীয় সীমারেখা। হিমালয়ের পূর্বপ্রান্তে আসাম ও লুসাই পর্বতমালা, পার্বত্য চট্টগ্রাম ও আরাকানের অনুচ্চ পর্বতশ্রেণী ভারতকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছে মায়ানমার ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া থেকে। ভারতীয় উপমহাদেশের দক্ষিণে আরব সাগর ভারত মহাসাগর আর বঙ্গোপসাগর সুনিশ্চিত করেছে ভারতের বিচ্ছিন্ন অস্তিত্ব।

৩ উপর্যুক্ত সীমারেখার মধ্যে আবদ্ধ ভারত উপমহাদেশের বিশাল ভূ-ভাগের মধ্যে রয়েছে ভৌগোলিক বৈচিত্র্য।

উপর্যুক্ত সীমারেখার মধ্যে আবদ্ধ ভারত উপমহাদেশের বিশাল ভূ-ভাগের মধ্যে রয়েছে ভৌগোলিক বৈচিত্র্য। উত্তরের সমভূমি আর দাক্ষিণাত্যের মালভূমির মধ্যে প্রাকৃতিক দেয়ালের মতো দাঁড়িয়ে আছে পূর্ব-পশ্চিমে বিস্তৃত বিন্ধ্য পর্বতমালা। যার পশ্চিমে আরাবল্লি পর্বত রাজস্থানের মরুময় অঞ্চলের মধ্যে বিস্তার রয়েছে তার কয়েকটি শাখা-প্রশাখা। হিমালয় থেকে বিন্ধ্য পর্যন্ত বিস্তৃত উত্তর ভারতের সমতল ভূমি। যার সর্ব পশ্চিমে সিন্ধু নদ ও তার শাখা প্রশাখা বিধৌত পাঞ্জাব ও সিন্ধুর সমতলভূমি। পাঞ্জাব থেকে পূর্ব দিকে বিহার পর্যন্ত বিস্তৃত উত্তর ভারতের গঙ্গা-যমুনা বিধৌত বিশাল সমভূমি।

বিন্ধ্য পর্বতের দক্ষিণে দাক্ষিণাত্যের সামুদ্রিক জলবেষ্ঠিত উপদ্বীপ। দাক্ষিণাত্যের মালভূমির পশ্চিমে রয়েছে পশ্চিমঘাট ও পূর্বে পূর্বঘাট পর্বতশ্রেণী। উপদ্বীপের প্রায় মাঝামাঝি চন্দ্রগিরি পর্বতশ্রেণী। কৃষ্ণা, কাবেরী আর গোদাবরীর জলরাশি এই মালভূমির সমতল ভূ-ভাগকে করেছে উর্বরা।

উত্তর ভারতের বিস্তীর্ণ সমভূমির দক্ষিণ-পশ্চিমে রাজস্থান ও সিন্ধুর মধ্যে রয়েছে থর মরুভূমি। আর এই সমভূমির দক্ষিণ-পূর্বে রয়েছে বাংলার ব-দ্বীপ। মৌসুমী বায়ুর প্রভাবে দক্ষিণ ভারতের পূর্বাংশ আর উত্তর

ভারতের পূর্বাংশে লক্ষ করা যায় বৃষ্টিবহুল পরিবেশের। সমগ্র উত্তর ভারতের অবশিষ্ট অংশে শুষ্ক আবহাওয়া, ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্যাবলী উপমহাদেশের ইতিহাসে যে প্রভাব ফেলেছে তা আমরা এখন সংক্ষেপে আলোচনা করবো।

ইতিহাসে ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্যাবলীর প্রভাব

হিমালয়ের প্রভাব ঃ হিমালয় ভারত উপমহাদেশকে উত্তরের হিমপ্রবাহ থেকে রক্ষা করেছে, তাই উত্তর ভারতের বিস্তৃত মালভূমি আবাসোপযোগী হয়েছে। হিমালয় থেকে সৃষ্টি হয়েছে উত্তর ভারতের প্রধান প্রধান নদী প্রবাহের। আর এই নদীর জলরাশিকে ভিত্তি করেই গড়ে ওঠেছে উত্তর ভারতের কৃষি। দক্ষিণ থেকে উত্তরে প্রবাহমান মৌসুমী বায়ু হিমালয়ে বাধাপ্রাপ্ত হয়েই ভারতীয় উপমহাদেশে দান করেছে বৃষ্টিপাত। উত্তর ভারতের মানুষের জীবনযাত্রা নিয়ন্ত্রণে হিমালয়ের প্রভাবকে স্বীকার করেই হিমালয় প্রাচীন ভারতীয়দের মানসে দেবতার আসনে অধিষ্ঠিত হয়েছে।

হিমালয় ও পশ্চিমের পার্বত্য সীমারেখার কারণে ভারতীয়দের মনে সৃষ্টি হয়েছে এক ভ্রান্ত নিরাপত্তার ধারণা।

হিমালয় ও পশ্চিমের পার্বত্য সীমারেখার কারণে ভারতীয়দের মনে সৃষ্টি হয়েছে এক ভ্রান্ত নিরাপত্তার ধারণা। ভারতবাসী এই পার্বত্য সীমারেখাকে মনে করেছে অলঙ্ঘনীয়। আর ভ্রান্ত নিরাপত্তার ধারণার বশবর্তী হয়ে ভারতবাসী বিদেশী আক্রমণের কথা খুব একটা চিন্তা করেনি। তাই যুগে যুগে উত্তর-পশ্চিমের গিরিপথগুলো দিয়ে, বিশেষ করে খাইবার গিরিপথের মধ্যদিয়ে ভারত আক্রান্ত হয়েছে বিদেশীদের আক্রমণে। উত্তর-পশ্চিমের পথ দিয়েই এসেছে আর্য প্রবাহ, এসেছে গ্রিক, কুষাণ, হুণ, আফগান, তুর্কি আর মোঙ্গল আক্রমণ। ভারত ভ্রান্ত নিরাপত্তা বোধ থেকে বারবারই ব্যর্থ হয়েছে বিদেশীদের প্রতিরোধ করতে।

বিন্ধ্য পর্বতের প্রভাব ঃ বিন্ধ্যের অবস্থান ভারতকে দুভাগে ভাগ করেছে– উত্তর ভারত ও দাক্ষিণাত্য, উত্তর ভারতের বিস্তীর্ণ, সমভূমি হয়েছে ইতিহাসের লালনক্ষেত্র। মানুষের কর্মকান্ডের প্রধান রঙ্গমঞ্চ। আর্যরা এসে পশ্চিম থেকে পূর্বদিকে ধীরে ধীরে সমগ্র উত্তর ভারতকে পরিণত করেছে আর্যাবর্তে। বিন্ধ্যের দক্ষিণে সরে গিয়েছে দ্রাবিড় ভাষা গোষ্ঠীর মানুষ। দ্রাবিড় ভূমিতে পরিণত হয়েছে দাক্ষিণাত্য। ভারতের ইতিহাসে উত্তর আর দক্ষিণের মধ্যে যে বৈরিতা লক্ষ করা যায়, তা মূলত বিন্ধ্যের কারণেই। উত্তর ভারতীয় সাম্রাজ্য স্থাপনের পর চেষ্টা চলেছে দাক্ষিণাত্য অধিকারের। আবার দাক্ষিণাত্যের শক্তিশালী সাম্রাজ্য ও চেষ্টা চালিয়েছে উত্তর ভারতে আধিপত্য বিস্তারে। উত্তর-দক্ষিণের মধ্যে সংঘর্ষ ভারতীয় ইতিহাসের বিশেষ বৈশিষ্ট্যে পরিণত হয়েছে।

ভারতের ইতিহাসে উত্তর আর দক্ষিণের মধ্যে যে বৈরিতা লক্ষ্য করা যায়, তা মূলত বিন্ধ্যের কারণেই।

ভারতের বিশালতার প্রভাব

ভারত একটি বিশাল উপমহাদেশ।এর বিশালতার কারণে ভারতীয় ইতিহাসে সৃষ্টি হয়েছে কিছুটা অন্তর্মুখিতার।ভারত এত বড় ও বিশাল যে, ভারতের মধ্যেই সব সাম্রাজ্যবাদী অভিপ্রায় চরিতার্থ করার সুযোগ রয়েছে। তাই ভারতের সাম্রাজ্যবাদীদের ভারতের বাইরে যাওয়ার চেষ্টা করতে হয়নি।

ভারতের বিশালতা আর ভৌগোলিক বৈচিত্র্যের কারণে ভারতের ইতিহাসে সৃষ্টি হয়েছে বিভিন্নতার মধ্যে ঐক্য স্থাপনের প্রবণতা।

ভারতের বিশালতা আর ভৌগোলিক বৈচিত্র্যের কারণে ভারতের ইতিহাসে সৃষ্টি হয়েছে বিভিন্নতার মধ্যে ঐক্য স্থাপনের প্রবণতা। বিশাল ভারতের বিভিন্ন ভৌগোলিক পরিবেশে সৃষ্টি হয়েছে বিভিন্ন আঞ্চলিক সত্তা। সেই আঞ্চলিক সত্তার উপস্থিতি ভারতের ইতিহাসের সব যুগেই লক্ষ করা যায়। আঞ্চলিক রাজনৈতিক সত্তার মধ্যেই সৃষ্টি হয়েছে আঞ্চলিক ভাষার আঞ্চলিক সংস্কৃতির।আঞ্চলিক সত্তাসমূহের বিলোপ সাধন করে একচ্ছত্র আধিপত্য বিস্তারের অভিলিপ্সা যুগে যুগে ভারতের ইতিহাসের প্রধান লক্ষবস্তু হিসেবে প্রকাশ পেলেও একথা স্বীকার করতেই হয় যে, কখনোই সর্বভারতীয় ঐক্য স্থাপন করা সম্ভব হয়নি। মৌলিক কিছু সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে ঐক্য লক্ষ করলেও আঞ্চলিক বিভিন্নতা ভারতীয় সংস্কৃতিকে সমৃদ্ধ করেছে। বৈচিত্র্যই ভারতীয় সংস্কৃতিতে এনেছে উৎকর্ষ।

নদ-নদীর প্রভাব

সিন্ধু ও পঞ্চনদের জলরাশি সৃষ্টি করেছে উৎপাদনশীল পশ্চিম ভারতের সমভূমি। গঙ্গা-যমুনার সৃষ্ট উত্তর ভারতের বিস্তীর্ণ সমভূমি, গোদাবরী, কৃষ্ণা ও কাবেরী সৃষ্টি করেছে দাক্ষিণাত্যের মানব বসতির অনুকূল পরিবেশ। এছাড়াও আরো অসংখ্য নদীকে ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে কৃষি ভিত্তিক মানব সমাজ। কৃষি অর্থনীতিই ছিল ভারতে মানুষের সকল কর্মকান্ডের মূল ভিত্তি। পশ্চিম ভারতে সিন্ধু সভ্যতার বিকাশ, পরবর্তী পর্যায়ে উত্তর ভারতে আর্য-সভ্যতার বিকাশ নদী বিধৌত এলাকাকেই কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল। দক্ষিণ ভারতের সাম্রাজ্যগুলোও গড়ে উঠেছিল মালভূমির উর্বরা ভূ-খন্ডে। উত্তর ভারতের মৌর্য সাম্রাজ্য, কুষাণ সাম্রাজ্য, গুপ্ত সাম্রাজ্য বা পুষ্যভূতি সাম্রাজ্য সবই গড়ে উঠেছিল নদীবিধৌত সমভূমির ওপর আধিপত্য বিস্ত্মরের মাধ্যমে। মধ্যযুগে দিল্লির সুলতানদের সাম্রাজ্যও সিন্ধু, গঙ্গা-যমুনা বিধৌত এলাকার ওপর আধিপত্যকে ভিত্তি করেই গড়ে উঠেছিল। অবশ্য সমুদ্র-বাণিজ্য ভারতের সাম্রাজ্যবাদকে যুগে যুগে দিয়েছিল অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি। আর সমৃদ্ধির কারণেই উৎকর্ষ অর্জিত হয়েছিল বিভিন্ন শিল্পকলায়। ভারতের পশ্চিমে, দক্ষিণে ও পূর্বে অবস্থিত সমুদ্রের কারণে যে বাণিজ্যিক সমৃদ্ধি সহজলভ্য হয়েছিল সেকথা বলার অপেক্ষা রাখে না।

অসংখ্য নদীকে ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে কৃষি ভিত্তিক মানব সমাজ। কৃষি অর্থনীতিই ছিল ভারতে মানুষের সকল কর্মকান্ডের মূল ভিত্তি।

৭. অবশ্য সমুদ্র-বাণিজ্য ভারতের সাম্রাজ্যবাদকে যুগে যুগে দিয়েছিল অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি। আর সমৃদ্ধির কারণেই উৎকর্ষ অর্জিত হয়েছিল বিভিন্ন শিল্পকলায়।

'বাংলা'র ভৌগোলিক পরিচয় ও প্রভাব

বাংলার ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্যাবলী এদেশের ইতিহাসকে যুগযুগ ধরে প্রভাবিত করেছে। প্রথমেই বাংলা বলতে কোন ভূ-খন্ডকে বোঝাতো তা স্পষ্ট করে নেয়া প্রয়োজন। মোটামুটিভাবে ১৯৪৭-এর পূর্বে ব্রিটিশ ভারতের 'বেঙ্গল' প্রদেশের ভূ-খন্ডকেই 'বাংলা' অঞ্চল হিসেবে ধরা হয়েছে– বর্তমানে এই ভূখন্ডেই আমাদের বাংলাদেশ ও ভারতের পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ। ইতিহাসের দৃষ্টিতে এই ভূ-খন্ডের একটি আঞ্চলিক সত্তা ছিল এবং ভূগোলবিদগণ উপমহাদেশের মধ্যে 'বাংলা'কে একটি ভৌগোলিক 'অঞ্চল' বলে স্বীকার করেছেন।

প্রায় ৮০ হাজার বর্গমাইল বিস্তৃত নদীবাহিত পলি দ্বারা গঠিত এক বিশাল সমভূমি এই বাংলা। এর পূর্বে ত্রিপুরা, গারো ও লুসাই পাহাড়, উত্তরে শিলং মালভূমি ও নেপালের তরাই অঞ্চল, পশ্চিমে রাজমহল ও ছোট নাগপুর পর্বতরাজির উচ্চ ভূমি এবং দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর। এই বিস্তৃত সমভূমির দক্ষিণ দিক সাগরাভিমুখে ঢালু এবং গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র-মেঘনার জলরাশি দ্বারা বয়ে আনা বিপুল পরিমাণ পলি সাগরে উৎসারিত হচ্ছে। সমুদ্রোপকূলবর্তী নিম্নভূমি জঙ্গলাকীর্ণ।এর পেছনেই (অর্থাৎ উত্তরে) প্রায় ৫০ হাজার বর্গমাইল সমতল ভূমি, যার গঠনে গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র-মেঘনা প্রবাহের অবদান রয়েছে। এই বিস্তৃত সমতলভূমির মধ্যে ত্রিপুরা অঞ্চল নিকটবর্তী প্লাবন ভূমির তুলনায় গড়ে ৬ ফুট উঁচু এবং এর মাঝামাঝি রয়েছে লালমাই পাহাড়। সিলেট এলাকাও গড়ে প্রায় ১০ ফুট উঁচু এবং এরই দক্ষিণ সীমায় অবস্থিত প্লাইস্টোসিন যুগের সুগঠিত মধুপুর উচ্চভূমি। এই সুগঠিত উচ্চভূমির উত্তর-পশ্চিমে বিস্তৃতিই হচ্ছে 'বরেন্দ্র' বা 'বারিন্দ্র' এলাকা। পশ্চিমে রাজমহল ও ছোট নাগপুর পাহাড় সংলগ্ন উত্তর থেকে দক্ষিণাভিমুখে বিস্তৃত প্লাইস্টোসিন ভূ-ভাগ রয়েছে। নীহাররঞ্জন রায়ের ভাষায় "একদিকে সুউচ্চ পর্বত, দুই দিকে কঠিন শৈলভূমি, আর একদিকে বিস্তীর্ণ সমুদ্র; মাঝখানে সমভূমির সাম্য– ইহাই বাঙালীর ভৌগোলিক ভাগ্য।" সামগ্রিকভাবে ভূ-প্রাকৃতিক গঠন বৈশিষ্ট্যের আলোকে বাংলাকে পাঁচটি ভাগে বিভক্ত করা যেতে পারে– (১) উত্তর বাংলার পাললিক সমভূমি; (২) ব্রহ্মপুত্র-মেঘনা অন্তর্বর্তী ভূ-ভাগ; (৩) ভাগীরথী-মেঘনা অন্তর্বর্তী ব-দ্বীপ; (৪) চট্টগ্রামাঞ্চলের অনুচ্চ পার্বত্য এলাকা এবং (৫) বর্ধমানাঞ্চলের অনুচ্চ পার্বত্য এলাকা।

মোটামুটিভাবে ১৯৪৭-এর পূর্বে ব্রিটিশ ভারতের 'বেঙ্গল' প্রদেশের ভূ-খন্ডকেই 'বাংলা' অঞ্চল হিসেবে ধরা হয়েছে– বর্তমানে এই ভূখন্ডেই আমাদের বাংলাদেশ ও ভারতের পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ।

প্রায় ৮০ হাজার বর্গমাইল বিস্তৃত নদীবাহিত পলি দ্বারা গঠিত এক বিশাল সমভূমি এই বাংলা।

অবস্থানগত বিবেচনায় বাংলা ভারতীয় উপমহাদেশের সর্বপূর্ব প্রান্তের অঞ্চল। বাংলার উত্তরে প্রকান্ড হিমালয় পর্বত ও নেপাল। পূর্বে মনিপুর, আসাম, ত্রিপুরা ও মায়ানমার। পশ্চিমে ভারতের বিহার এবং দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর।

বাংলার ভূ-প্রকৃতিতে সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নদীমালার। প্রধান নদীগুলোর স্রোতধারাই বাংলাকে মূলত চারটি ভাগে বিভক্ত করেছে ঃ উত্তর, পশ্চিম, মধ্য ও পূর্ব। প্রত্যেকটি বিভাগেরই যেমন রয়েছে ভৌগোলিক

সত্তা তেমনি ঐতিহাসিক সত্তা। যাহোক, বাংলার নদ-নদীর মধ্যে গঙ্গাই প্রধান। রাজমহলকে স্পর্শ করে গঙ্গা বাংলার সমতলভূমিতে প্রবেশ করেছে। সমতলভূমিতে প্রবেশ করেই গঙ্গার দুটি প্রধান প্রবাহ লক্ষ করা যায়– একটি পূর্ব দক্ষিণগামী, নাম পদ্মা, অন্যটি মৌজা দক্ষিণমুখী নাম ভাগীরথী। গঙ্গার আরো অনেক শাখা প্রশাখা বাংলার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে। বাংলার নদীসমূহের মধ্যে দ্বিতীয় প্রধান প্রবাহ ব্রহ্মপুত্র, বাংলার উত্তর-পূর্ব ও পূর্বাঞ্চলের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে আসামের ভিতর দিয়ে গতিপথ কিছুটা দক্ষিণ-পশ্চিমগামী এবং রংপুর ও কুচবিহারের সীমান্ত দিয়ে বাংলায় প্রবেশ করেছে। বেশ কয়েকবার গতিপথ পরিবর্তন করে ব্রহ্মপুত্র বর্তমান যমুনা-পদ্মার পথে মেঘনার সাথে মিলিত হয়ে সমুদ্রে পড়েছে। বাংলার পুর্বাঞ্চলের প্রধান নদীপ্রবাহ মেঘনা, এই নদী শিলং মালভূমি ও সিলেটের জলসম্ভার নিয়ে সমুদ্রে পড়েছে। মেঘনার উত্তর প্রবাহের নাম সুরমা।আঞ্চলিক নদীসমূহের মধ্যে পশ্চিমাঞ্চলে অজয় দামোদর, কাঁসাই, দ্বারকেশ্বর, রূপনারায়ণ, সরস্বতী; আর উত্তরাঞ্চলে করতোয়া, আত্রাই, পূনর্ভবা ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। বাংলার প্রশাসনিক কেন্দ্রগুলো কোন না কোন নদীর তীরে গড়ে উঠেছিল। বাণিজ্য কেন্দ্রগুলোও ছিল নদীরই তীরে।

বাংলার ভূ-প্রকৃতিতে সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নদীমালার।

বাংলার ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্যাবলী

বাংলার ভৌগোলিক পরিচয় থেকে এ অঞ্চলের ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্যগুলো খুঁজে পাওয়া যায়। প্রথমত, গাঠনিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায় বাংলা ভূ-খন্ডের অস্তিত্ব বা অবস্থান উপমহাদেশের সর্বপূর্বান্তে নির্ধারিত হয়েছে। দ্বিতীয়ত, ভূ-তাত্ত্বিকভাবে বাংলা সুগঠিত ভূ-ভাগ এবং অপেক্ষাকৃত নবীন ভূ-ভাগের সমন্বয়ে সৃষ্ট। তৃতীয়ত, বাংলা পৃথিবীর বৃহত্তম ব-দ্বীপ বা 'ডেল্টা'। চতুর্থত, বাংলা মৌসুমী জলবায়ুর দেশ, বৃষ্টিবহুল অঞ্চল। পঞ্চমত, এর দক্ষিণে উন্মুক্ত সমুদ্রদ্বার এবং অঞ্চলটি নদী বহুল। এ সকল বৈশিষ্ট্য বাংলার ইতিহাসে বহুমুখী প্রভাব বিস্তার করেছে।

১১. বাংলার প্রশাসনিক কেন্দ্রগুলো কোন না কোন নদীর তীরে গড়ে উঠেছিল। বাণিজ্য কেন্দ্রগুলোও ছিল নদীরই তীরে।

ইতিহাসে প্রভাব

মানুষ প্রকৃতির ওপর শর্তবদ্ধ এবং তাঁর কার্যাবলি কখনোই পরিবেশের প্রভাবকে এড়িয়ে চলতে পারে না। এ মন্তব্যটির যথার্থতা বাংলার ক্ষেত্রেও প্রমাণিত হয়। বাঙালির সমাজ জীবনের বৈচিত্র্য, সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য, ধর্মীয় জীবনের স্বকীয়তা, এমনকি রাজনৈতিক জীবনের ওপরও ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্যাবলী গভীরভাবে প্রভাব বিস্তার করেছে। অবস্থানগত কারণে বাংলায় অনার্য প্রভাব প্রাধান্যের বিষয়টি আজ প্রমাণিত সত্য। আর্য প্রবাহ পথ থেকে দূরে থাকায় বাংলার জীবন যাত্রার ওপর অনার্য সংস্কৃতি দৃঢ় হবার সুযোগ পেয়েছে। উত্তর-পশ্চিম ভারত যতটা আর্যায়িত হয়েছে বাংলা ঠিক ততোটা হয়নি। বাংলার "ভৌগোলিক ব্যক্তিত্বে" তাই দেশজ উপাদান উপকরণের প্রভাব অনেক বেশি। প্রাচীন বাংলার ধর্মীয় সংস্কৃতিতেও ভৌগোলিক প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। এখানকার ধর্মীয় জীবনে "মানবতা" ও "উদারতা" প্রাধান্য বিস্তার করে আছে। প্রাচীন বাংলায়– বৌদ্ধ ধর্মের আগমন, বিস্তার, ধর্মীয় সহিষ্ণুতা, বৌদ্ধধর্মের বিকৃতিকরণ, হিন্দু ধর্মের সাথে আপোষ, মূর্তি পূজার প্রচলন, কিংবা পরবর্তীকালে ইসলাম ধর্মের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি, মাজার সংস্কৃতির প্রাধান্য, পীর, সুফিদের প্রতি ভক্তি ইত্যাদি ঘটনা বাংলার "আঞ্চলিক ব্যক্তিত্ব"কেই তুলে ধরে।

বাংলার ভৌগোলিক পরিচয় থেকে এ অঞ্চলের ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্যগুলো খুঁজে পাওয়া যায়।

১৩. বাঙালির সমাজ জীবনের বৈচিত্র্য, সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য, ধর্মীয় জীবনের স্বকীয়তা, এমনকি রাজনৈতিক জীবনের ওপরও ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্যাবলী গভীরভাবে প্রভাব বিস্তার করেছে।

বাংলার শিল্পকলার ক্ষেত্রে স্বকীয়তা ও এ অঞ্চলের ভৌগোলিক উপাদানের মাধ্যমেই নির্ধারিত হয়েছে। যেমন বাংলার বিশেষ ধরনের মাটি, পোড়ামাটির শিল্প, অলংকৃত ইট তৈরিতে সাহায্য করেছে যা প্রাচীন শিল্পকলায় অনন্য হিসেবে চিহ্নিত হয়ে থাকে। এছাড়া বাঁশের ব্যবহারও শিল্পকলায় স্বকীয়তা দান করেছে।

প্রাচীন যুগ থেকেই বাঙলার অর্থনৈতিক জীবনে ভূগোলের দান অপরিসীম। কৃষি, শিল্প এবং ব্যবসা-বাণিজ্যের সবটুকুই ভৌগোলিক অবস্থান ও পরিবেশের ওপর ছিল নির্ভরশীল। বাংলার অবস্থান, মৌসুমী জলবায়ু, অসংখ্য নদ-নদী এ অঞ্চলকে উর্বর কৃষিক্ষেত্রে পরিণত করেছে। ধান, ইক্ষু, আম, ডালিম, কলা, গুবাক, কাঁঠাল ইত্যাদি এখানকার প্রাচীন ভূমিজাত দ্রব্য। নদী, বন্যা ও মৌসুমী জলবায়ু বিপুল ধান

উৎপাদনে সহায়ক ছিল। তবে এই তিনটি বৈশিষ্ট্য বাঙালি চরিত্রে "আলস্য" প্রবণতাও যুক্ত করেছে। ধান, কার্পাস, চিনি, লবণ ইত্যাদি শিল্প প্রাচীনকালে বিকশিত হয়। বাংলার বস্ত্র শিল্পের খ্যাতি প্রাচীনকাল থেকেই পৃথিবীব্যাপী ছড়িয়ে পড়েছিল। এছাড়া নৌ-শিল্পেও বাংলার অগ্রগতি ছিল দৃষ্টান্তমূলক। ব্যবসা-বাণিজ্যে বাঙালি ভৌগোলিক সুবিধার সদ্ব্যবহার করেছে। নদ-নদী এবং উন্মুক্ত সমুদ্র দ্বারের কারণে বাংলা বৃহত্তর বাণিজ্য বলয়ের সঙ্গে সহজেই যুক্ত হয়েছে। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সাথে বাংলার ছিল গভীর বাণিজ্যিক সম্পর্ক। এছাড়া আরবের বণিকেরাও এ অঞ্চলের সাথে বাণিজ্যিক সম্পর্ক বজায় রেখেছে।

১৪. বাংলার আঞ্চলিক রাজনৈতিক শক্তিগুলো তাঁদের দীর্ঘকালীন শাসনে বাঙালি সংস্কৃতির নির্মাণে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ভূমিকা রেখেছেন।

রাজনৈতিক দিক থেকেও ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্যাবলী বাংলাকে সুরক্ষিত করেছে। সর্বভারতীয় সাম্রাজ্যবাদী শক্তি প্রাকৃতিক বাঁধার কারণে পূর্বাঞ্চলের দিকে অভিযান প্রেরণে খুব একটা আগ্রহী ছিল না। এ অঞ্চলের জলবায়ু, নদ-নদী, স্যাঁতস্যাঁতে আবহাওয়া ছিল তাদের অনাগ্রহের অন্যতম কারণ।এ সুযোগে বাংলার স্বকীয় রাজনৈতিক সত্তার বিকাশ ঘটতে পেরেছে। অবশ্য সর্বভারতীয় রাজশক্তির আগ্রাসন একেবারে যে হয়নি তা নয়। অল্প সময়ের জন্য হলেও সর্বভারতীয় সাম্রাজ্যের সুফল বাংলা ভোগ করেছে। বাংলার আঞ্চলিক রাজনৈতিক শক্তিগুলো তাঁদের দীর্ঘকালীন শাসনে বাঙালি সংস্কৃতির নির্মাণে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ভূমিকা রেখেছেন।

বাংলা নামের উৎপত্তি

সুপ্রাচীনকালে বাংলার ছিল কৌমভিত্তিক চেতনা, স্বতন্ত্র্য কিছু জনপদ, ঐক্য তখনও বাংলায় আসেনি; বঙ্গ, পুন্ড্র, রাঢ়, সমতট, হরিকেল, গৌড়সহ বিভিন্ন সময়ের বাংলার বিভিন্ন অংশ বিভিন্ন নামে পরিচিত ছিল। তবে 'বঙ্গ' নামটিই শেষ পর্যন্ত বৃহৎ আকারে 'বাঙ্গালা' নামে রূপান্তরিত হয়। অনেকে বঙ্গকে চীন তিব্বতী গোষ্ঠীর শব্দ এবং এ শব্দের 'অং' অংশের সঙ্গে গঙ্গা, হোয়াংহো, ইয়াংসিকিয়াং ইত্যাদি নদীর নামের সম্বন্ধ ধরে অনুমান করেন যে, শব্দটির মৌলিক অর্থ 'জলাভূমি' এবং 'বঙ্গ' নামের উদ্ভব হয়েছে বাংলার অসংখ্য নদ-নদী, বিল-হাওড়ের বাস্তব ভৌগোলিক অবস্থা থেকে। মধ্যযুগের ঐতিহাসিক আবুল ফজল 'আইন-ই-আকবরী' গ্রন্থে বলেন, 'বাঙ্গালার আদি নাম ছিল বঙ্গ। এখানকার রাজারা প্রাচীনকালে ১০ গজ উঁচু এবং ২০ গজ প্রশস্ত প্রকান্ড 'আল' নির্মাণ করতেন।এ থেকেই 'বাঙ্গাল' এবং 'বাঙ্গালাহ' নামের উৎপত্তি।" নদীমাতৃক, বারিবহুল এবং বন্যা ও জোয়ারের দেশে ছোট বড় 'আল' বা 'আইল' বা 'বাঁধ' নির্মাণ করার যুক্তি একেবারে অগ্রহণযোগ্য নয়।

প্রাচীন যুগে হিন্দু-বৌদ্ধ শাসনামলে সমগ্র বাংলার ভূভাগ বিভিন্ন জনপদের নামে পরিচিত ছিল। মুসলমানদের আগমনের পর বাংলায় রাজনৈতিক ঐক্য আসে। অবশ্য সেন আমলেই প্রথম সমগ্র বাংলা রাজনৈতিকভাবে ঐক্যবদ্ধ হয়। 'বাংলা' নামের উৎপত্তির ইতিহাস খুঁজতে হলে সুলতান শামসউদ্দিন ইলিয়াস শাহের কথা বলতেই হবে। বস্তুত ইলিয়াস শাহই (১৩৫২ খ্রিঃ) সত্যিকার অর্থে 'বাঙ্গালা' নাম প্রদানের কৃতিত্বের অধিকারী। একই সাথে একথাও আজ ঐতিহাসিকভাবে সত্য যে, ইলিয়াস শাহই বাংলার তিনটি শাসনকেন্দ্রের (লখনৌতি, সাতগাঁও, সোনারগাঁও) ওপর তাঁর নিয়ন্ত্রণ স্থাপন করেন এবং 'লখনৌতির মুসলিম রাজ্যকে' 'বাঙ্গালার মুসলিম রাজ্য' হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেন। সম্ভবত এরপর থেকেই সমগ্র বাংলাভাষী অঞ্চলের জন্য 'বাঙ্গালা' নামটি ব্যবহৃত হতে থাকে। সমকালীন ভারতের ঐতিহাসিক শামস-ই-সিরাজ আফীফ ইলিয়াস শাহকে অভিহিত করেন "শাহ-ই-বাঙালাহ্' বা 'শাহ-ই-বাঙালীয়ান' আখ্যায়। ইলিয়াস শাহের সেনাবাহিনীকে বলা হয়েছে 'বাঙ্গালার পাইক'। বাংলার শ্রেষ্ঠ সুলতান আলাউদ্দিন হুসেন শাহের আমলে 'বাঙ্গালা' এবং এখানকার অধিবাসীদের 'বাঙ্গালি' নাম সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। পরবর্তীকালে মুঘলদের আমলে বাংলা পরিচিত হয় 'সুবা বাঙ্গালা' হিসেবে। আরো পরে পর্তুগিজ, ইংরেজ এবং অন্যান্য ইউরোপীয়রা বাংলাকে 'বেঙ্গালা', 'বেঙ্গল' নামে অভিহিত করেছে। ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত বাংলা অঞ্চল সারা পৃথিবীতে 'বেঙ্গল' হিসেবেই পরিচিত ছিল।

সারসংক্ষেপ

ভূগোল ইতিহাসের ভিত্তি। একটি দেশের ভৌগোলিক অবস্থান, পাহাড়-পর্বত, নদ-নদী, জলবায়ু সামগ্রিকভাবে সেই দেশের আর্থ-সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক ইতিহাসে প্রভাব বিস্তার করে। ভারতের ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্যাবলী খুবই আকর্ষণীয়। পাহাড়, পর্বত, জঙ্গল, নদী, সমুদ্র– সবকিছু মিলে ভারতের নিজস্ব ভৌগোলিক অস্তিত্ব রয়েছে। ভৌগোলিক বৈচিত্র্য বিবেচনায় এবং বিশালতার কারণেভারতকে উপমহাদেশ বলা হয়। পূর্ব-পশ্চিমে বিস্তৃত বিন্ধ্য পর্বতমালা ভারতকে সুস্পষ্ট দুটি ভাগে ভাগ করেছে– উত্তর ভারত ও দক্ষিণ ভারত। হিমালয় পর্বত ভারতের ইতিহাসের অনেকটাই নিয়ন্ত্রণ করে। হিমালয়, বিন্ধ্য পর্বতমালা, ভূ-প্রাকৃতিক বৈচিত্র্য, নদ-নদী ইত্যাদির প্রভাবে প্রাচীন যুগ থেকেই ভারতের ইতিহাস স্বকীয় বৈশিষ্ট্যমন্ডিত হয়েছে।

বাংলার ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্যাবলীও এদেশের ইতিহাসকে যুগ যুগ ধরে প্রভাবিত করেছে। বাংলারও রয়েছে পৃথক ভৌগোলিক সত্তা এবং 'ঐতিহাসিক সত্তা'। অবস্থানগত বিবেচনায় বাংলা ভারতের সর্বপূর্বপ্রান্তে অবস্থিত। নদ-নদী, ভূ-গঠন, ব-দ্বীপ, মৌসুমী জলবায়ু, উন্মুক্ত সমুদ্রদ্বার সবকিছুই বাংলার ইতিহাসে স্বকীয় মাত্রাযুক্ত করেছে। বাংলার সাংস্কৃতিক জীবনের স্বকীয়তার প্রশ্নে ভৌগোলিক প্রভাব গভীরভাবে সম্পর্কিত।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন ঃ

সঠিক উত্তরের পাশে টিক ($\surd$) চিহ্ন দিন।

১। ভারতের পশ্চিম সীমান্তে কোন পর্বতমালা অলংঘনীয় প্রাকৃতিক সীমারেখা সৃষ্টি করেছে?
(ক) হিমালয় (খ) বিন্ধ্য
(গ) হিন্দুকুশ ও ক্ষীরথর (ঘ) আসাম ও লুসাই।

২। পাঞ্জাব থেকে পূর্বদিকে বিহার পর্যন্ত বিস্তৃত–
(ক) গঙ্গা-যমুনা বিধৌত সমভূমি (খ) উত্তর ভারতের সমতল ভূমি
(গ) দাক্ষিণাত্যের মালভূমি (ঘ) পাঞ্জাব ও সিন্ধুর সমতল ভূমি।

৩। কোন পর্বত ভারতকে দুভাগে বিভক্ত করেছে?
(ক) হিমালয় (খ) পূর্বঘাট পর্বতশ্রেণী
(গ) আসাম ও লুসাই (ঘ) বিন্ধ্য।

৪। কোনটি দাক্ষিণাত্যের নদী নয়?
(ক) ব্রহ্মপুত্র (খ) কাবেরী
(গ) গোদাবরী (ঘ) কৃষ্ণা।

৫। বাংলার পূর্বসীমায় কোন পাহাড় অবস্থিত?
(ক) ত্রিপুরা, লুসাই (খ) রাজমহল, ছোটনাগপুর
(গ) হিমালয় (ঘ) লালমাই।

৬। 'একদিকে সুউচ্চ পর্বত, দুই দিকে কঠিন শৈলভূমি, আর একদিকে বিস্তীর্ণ সমুদ্র; মাঝখানে সমভূমির সাম্য– ইহাই বাঙালীর ভৌগোলিক ভাগ্য'– উক্তিটি কার?
(ক) আর.সি. মজুমদার (খ) ডি.কে. চক্রবর্তী
(গ) নীহাররঞ্জন রায় (ঘ) অমিতাভ ভট্টাচার্য।

৭। বাংলায় কোন সংস্কৃতির প্রভাবের প্রাধান্য রয়েছে?
(ক) আর্য (খ) অনার্য
(গ) অস্ট্রিক (ঘ) দ্রাবিড়।

৮। প্রাচীন যুগে বাংলার অনন্য শিল্পকলা কোনটি?
(ক) পোড়ামাটির শিল্প (খ) স্থাপত্য শিল্প
(গ) ভাস্কর্য শিল্প (ঘ) চিত্রকলা।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ঃ

১। বাংলা নামের উৎপত্তি সম্পর্কে যা জানেন লিখুন।
২। ভারতীয় উপমহাদেশে ইতিহাসে হিমালয় পর্বতমালা ও নদ-নদীর প্রভাব বর্ণনা করুন।

রচনামূলক প্রশ্ন ঃ

১। ভারতীয় উপমহাদেশের ভৌগোলিক অবস্থান ও বৈশিষ্ট্যসমূহ চিহ্নিত করুন। ইতিহাসে এর কি প্রভাব লক্ষ্য করা যায়?
২। ভারত উপমহাদেশের মধ্যে 'বাংলা'র অবস্থান ও ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্যাবলী আলোচনা করুন। বাংলার সংস্কৃতি ও ইতিহাসের ওপর ভৌগোলিক প্রভাব মূল্যায়ন করুন।
৩। বাংলার অবস্থান বাংলার ইতিহাসকে কিভাবে প্রভাবিত করেছে?
৪। ভারতীয় উপমহাদেশের ভৌগোলিক পরিচয় দিন। হিমালয় ও বিন্ধ্য পর্বতমালা ইতিহাস ও সংস্কৃতিতে কি প্রভাব ফেলেছে?

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

১। Amitav Bhattacharyya, *Historical Geography of Ancient and Early Medieval Bengal*.
২। আবদুল মমিন চৌধুরী, 'বাংলার ভৌগোলিক পরিচয়', *বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস*, ১ম খন্ড (আনিসুজ্জামান সম্পাদিত)
৩। নীহাররঞ্জন রায়, *বাঙালীর ইতিহাস, আদিপর্ব।*
৪। R.C. Majumdar, *History of Ancient Bengal.*
৫। R.C. Majumdar, *The History and Culture of the Indian People*, Vol-*Vedic Age.*
৬। প্রভাতাংশু মাইতী, *ভারত ইতিহাস পরিক্রমা*, ১ম খন্ড।

পাঠ - ২

প্রাচীন ভারতের ইতিহাসের উৎস

উদ্দেশ্য

এই পাঠ পড়ে আপনি–

- *প্রাচীন ভারতের ইতিহাস পুনর্গঠনের বিভিন্ন ধরনের উৎসের বিবরণ দিতে পারবেন ;*
- *বিভিন্ন উৎসের গুণাগুণ বর্ণনা করতে পারবেন।*

প্রাচীন ভারতের ইতিহাস পুনর্গঠনের উৎসগুলোকে প্রধানত তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। এগুলো হচ্ছে (ক) সাহিত্যিক উৎস, (খ) প্রত্নতাত্ত্বিক উৎস এবং (গ) বিদেশীদের বিবরণ।

(ক) সাহিত্যিক উৎস

প্রাচীন ভারতে সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় ও বিভিন্ন বিষয়ে লেখা বহু গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া গেলেও ইতিহাস সম্পর্কে লেখা কোনো গ্রন্থ পাওয়া যায় না। প্রাচীনকালে ভারতীয় পন্ডিতগণ কেন ইতিহাস গ্রন্থ রচনা করেননি সে সম্পর্কে আধুনিক গবেষক ও ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতানৈক্য রয়েছে। স্মিথ বলেছেন যে প্রাচীনকালে ভারতীয় পন্ডিতগণ ইতিহাস - গ্রন্থ রচনা করেছিলেন, কিন্তু কীট-পতঙ্গের আক্রমণে এবং ভূমিকম্প ও বন্যার মত প্রাকৃতিক দুর্যোগে সেগুলো ধ্বংস হয়ে গেছে। কীথের মতে খ্রিস্টের জন্মের আগে ভারতে বড় ধরনের কোনো বৈদেশিক আক্রমণ না হওয়ায়, ভারতীয়দের মধ্যে জাতীয় চেতনার উন্মেষ না ঘটায় ইতিহাস গ্রন্থ রচিত হয়নি। কীথ আরো বলেছেন যে ভারতবাসীরা পরলোক ও অদৃষ্টের ওপর অধিকতর বিশ্বাসী হওয়ায় ইতিহাস রচনার মত ইহলৌকিক বিষয়ে উৎসাহ বোধ করেনি। কিন্তু সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় এবং স্থাপত্য-ভাস্কর্য সৃষ্টিতে পরলোক-চিন্তা বাধা না হলে ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে এটা বাধা হবে কেন? আল-বেরুনী বলেছেন যে হিন্দুরা বিভিন্ন ঘটনার ঐতিহাসিক পরম্পরার প্রতি মনোযোগী ছিলেন না। প্রাচীনকালে হিন্দুদের প্রকৃত ইতিহাসবোধ আদৌ ছিল কিনা সে সম্পর্কে কোনো কোনো ঐতিহাসিক সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। তবে ড. রমেশচন্দ্র মজুমদারের মতে সে সময়ে ইতিহাস-চেতনা বা ইতিহাসের উপাদান-কোনটিরই অভাব ছিল না। অভাব ছিল বিভিন্ন তথ্যের সাহায্যে প্রকৃত সাহিত্যগুণ সম্পন্ন ইতিহাস রচনার ইচ্ছার এবং উৎসাহের।

প্রাচীনকালে ভারতীয় পন্ডিতগণ কেন ইতিহাস গ্রন্থ রচনা করেননি সে সম্পর্কে আধুনিক গবেষক ও ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতানৈক্য রয়েছে।

প্রাচীন ভারতের ইতিহাস রচনার জন্য আমরা সাহিত্যের অন্যান্য শাখায় উপাদান খুঁজে পাই। ভারতের প্রাচীনতম সাহিত্য হল বেদ যা চার ভাগে বিভক্ত। ঋগ্বেদ রচিত হয়েছিল ১৫০০-৯০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দের মধ্যে। অন্য তিনটি বেদ- সাম, যজুর এবং অথর্ব বেদ ৯০০-৬০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দের মধ্যে রচিত হয়েছিল বলে ধারণা করা হয়। বেদগুলো থেকে আর্য জাতির ভারত-আগমন এবং তাদের রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং ধর্মীয় জীবন সম্পর্কে জানা যায়।

ভারতের প্রাচীনতম সাহিত্য হল বেদ যা চার ভাগে বিভক্ত।

পুরাণ এক ধরনের ইতিহাস সাহিত্য যাতে বিভিন্ন রাজবংশের উল্লেখ রয়েছে। ভারতের দুই প্রাচীন মহাকাব্য রামায়ন ও মহাভারতে বহু ঐতিহাসিক উপাদান পাওয়া যায়। রামায়ন রচিত হয়েছিল খ্রিস্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দীর আগে, আর মহাভারতের রচনাকাল খ্রিস্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দী থেকে খ্রিস্টিয় পঞ্চম শতাব্দীর মধ্যে। পুরান এবং মহাকাব্য দুটিতে প্রাচীনকালের রাজাদের দীর্ঘ তালিকা আছে। বৌদ্ধ ও জৈন সাহিত্য থেকে প্রাচীন ভারতের ইতিহাস রচনার উপাদান পাওয়া যায়। সাহিত্যের অন্যান্য শাখা, যেমন নাটক, কাব্য,

ভারতের দুই প্রাচীন মহাকাব্য রামায়ন ও মহাভারতে বহু ঐতিহাসিক উপাদান পাওয়া যায়।

এমনকি ব্যাকরণ বই থেকেও মাঝে মাঝে ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাওয়া যায়। এগুলোর মধ্যে নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলো উল্লেখযোগ্য ঃ

দীপবংশ- খ্রিস্টিয় চতুর্থ শতকে রচিত কাব্যে শ্রীলংকার ইতিহাস, এর লেখকের নাম জানা যায় না।

জীবন–চরিত থেকে তথ্য সংগ্রহ করে ইতিহাস রচনা করা যায়, তবে এ ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন করা দরকার।

মহাবংশ- মহানাম রচিত একই সময়কালের শ্রীলংকার ইতিহাস।

পাণিনির অষ্টাধ্যায়ী- খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ শতকের পূর্বে রচিত একটি ব্যাকরণ বই।

পতঞ্জলির মহাভাষ্য- এটা পাণিনির অষ্টাধ্যায়ীর টীকা, রচিত হয়েছিল খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকে।

অর্থশাস্ত্র– রাষ্ট্রনীতি সম্পর্কিত এ গ্রন্থ রচনা করেছিলেন চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের প্রধানমন্ত্রী কৌটিল্য।

রঘুবংশ- কালিদাস রচিত এ কাব্যে সমুদ্রগুপ্তের রাজ্য বিজয়ের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। কালিদাসের মালবিকাগ্নিমিত্রম এর নায়ক অগ্নিমিত্র ছিলেন শুঙ্গ বংশের প্রতিষ্ঠাতা পুষ্যমিত্র শুঙ্গের পুত্র।

মুদ্রারাক্ষস- গুপ্তযুগে বিশাখদত্ত রচিত এ নাটকে রাজনৈতিক ইতিহাস সম্পর্কিত কিছু তথ্য পাওয়া যায়।

নীতিসার- গুপ্ত আমলে কামন্দক রচিত এ গ্রন্থের বিষয়বস্তু কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রের অনুরূপ।

প্রাচীন ভারতের ইতিহাস রচনার উৎস হিসাবে বিভিন্ন সময়ে রচিত রাজাদের জীবন-চরিতগুলোর উল্লেখ করা যেতে পারে।

প্রাচীন ভারতে রচিত একটি মাত্র গ্রন্থকে আধুনিক বিচারে বিজ্ঞান সম্মত ইতিহাস বলা যায়। বইটির নাম রাজতরঙ্গিনী।

হর্ষচরিত- হর্ষবর্ধনের জীবনী অবলম্বনে হর্ষচরিত লিখেছিলেন বাণভট্ট। এটা সংস্কৃত ভাষায় গদ্যে লিখিত।

গৌড়বাহ- খ্রিস্টিয় অষ্টম শতাব্দীতে বাকপতি এটা প্রাকৃত ভাষায় রচনা করেন। এটা কনৌজের রাজা যশোবর্মণ কর্তৃক গৌড়ের এক রাজাকে পরাজিত করার কাহিনী।

বিক্রমাঙ্কদেব চরিত- এর লেখকের নাম বিল্হন। ১০৮১-৮৯ খ্রিস্টাব্দে রচিত এ গ্রন্থে চালুক্য বংশীয় রাজা ষষ্ঠ বিক্রমাদিত্যের কীর্তিসমূহ বর্ণনা করা হয়েছে।

রামচরিত- দ্ব্যর্থবোধক এ কাব্যের রচয়িতা সন্ধ্যাকর নন্দী। এক ভাবে অর্থ করলে এটা রামায়নের কাহিনী, কিন্তু অন্যভাবে ব্যাখ্যা করলে এতে বাংলার পালবংশীয় রাজা রামপালের রাজত্বকালের কিছু বিবরণ পাওয়া যায়।

এ সব জীবন–চরিত থেকে তথ্য সংগ্রহ করে ইতিহাস রচনা করা যায়, তবে এ ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন করা দরকার। রচয়িতাগণ ছিলেন সভাকবি এবং রাজার অনুগ্রহপুষ্ট। ফলে রাজাদের প্রতি দুর্বলতা থাকা এবং তাঁদের অহেতুক গুণকীর্তন করা ছিল কবিদের পক্ষে স্বাভাবিক।

লেখ, মুদ্রা ও স্মৃতিসৌধের মত প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদানগুলো প্রাচীন ভারতের ইতিহাস জানতে আমাদের সাহায্যে করে।

প্রাচীন ভারতে রচিত একটি মাত্র গ্রন্থকে আধুনিক বিচারে বিজ্ঞান সম্মত ইতিহাস বলা যায়। বইটির নাম রাজতরঙ্গিনী, এর লেখকের নাম কল্হণ।তিনি ছিলেন কাশ্মিরের অধিবাসী এক ব্রাহ্মণ পন্ডিত। রাজতরঙ্গিনী কাশ্মিরের ইতিবৃত্ত। ১১৪৯-৫০ খ্রিস্টাব্দে এটা লেখা হয়েছিল। বইটি সংস্কৃত ভাষায় এবং পদ্যে লেখা।

(খ) প্রত্নতাত্ত্বিক উৎস

শুধুমাত্র সাহিত্যিক উপাদানের ওপর নির্ভর করতে হলে প্রাচীন ভারতের ইতিহাসের অনেক কিছুই আমাদের অজানা থেকে যেত। কিন্তু লেখ, মুদ্রা ও স্মৃতিসৌধের মত প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদানগুলো প্রাচীন ভারতের ইতিহাস জানতে আমাদের সাহায্যে করে।ভারতীয় প্রত্নতত্ত্বের বিকাশ ঘটেছে সাম্প্রতিককালে। লর্ড কার্জনের শাসনামলে এ বিভাগ প্রতিষ্ঠিত হয় এবং এর প্রথম মহাপরিচালক ছিলেন স্যার জন মার্শাল। প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধান ও গবেষণা কর্মে প্রধানত ড. বুকানন হ্যামিল্টন, জেমস প্রিন্সেপ, স্যার আলেকজান্ডার কানিংহাম, জেমস বার্জেস, স্যার জন মার্শাল, স্যার মর্টিমার হুইলার -এর মত কয়েকজন ইউরোপীয় পন্ডিত

অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিলেন। ভারতীয়দের মধ্যে যারা এ ক্ষেত্রে অগ্রণী ভুমিকা গ্রহণ করেছিলেন তাঁদের মধ্যে রাখালদাস বন্দোপাধ্যায়, কে. এন. দীক্ষিত, ননীগোপাল মজুমদার, ড. আহমদ হাসান দানী প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য।

লেখ বা লিপি

প্রাচীন ভারতের ইতিহাস পুনর্গঠনের ক্ষেত্রে লেখ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। পাথর বা ধাতব বস্তুতে উৎকীর্ণ হওয়ায় এগুলো দীর্ঘস্থায়ী হয় এবং এগুলো পরিবর্তন করা সহজ নয়। বৃহদাকার লেখগুলো স্থানান্তরযোগ্য না হওয়ায় এগুলোতে রাজ্যের সীমানা নির্ধারণে সাহায্য করে। লেখগুলোতে সব সময় তারিখ না থাকলেও এগুলো ব্যবহৃত লিপির প্রকৃতি থেকে এগুলোর প্রায় সঠিক সময়কাল নির্ণয় করা যায়। স্মিথ এবং ড. রমেশচন্দ্র মজুমদার উভয়েই নির্ভরযোগ্য উপাদান হিসাবে লেখকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও মূল্যবান বলে মনে করেন।

ভারতীয় লেখগুলোর মধ্যে অশোকের লেখগুলো প্রাচীনতম না হলেও গুরুত্বের দিক থেকে সেগুলোর স্থান প্রথম। শিলাখন্ড বা স্তম্ভের গায়ে উৎকীর্ণ রয়েছে সম্রাটের আদেশ ও নির্দেশ যা থেকে আমরা তাঁর ব্যক্তিত্ব, চরিত্র ও কার্যাবলী সম্পর্কে জানতে পারি। উত্তর পশ্চিম এলাকায় কয়েকটি লেখে খরোষ্ঠি বর্ণমালা ব্যবহৃত হয়েছে যা ডান দিক থেকে বামে লেখা হয়। ভারতের অন্যান্য অঞ্চলে পাওয়া অশোকের বাকী লেখগুলোতে ব্যবহৃত হয়েছে ব্রাহ্মী বর্ণমালা যা বাম দিক থেকে ডান দিকে লেখা হয়। ১৮৩৭ সালে ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কর্মকর্তা জেমস প্রিন্সেপ সর্বপ্রথম অশোকের লেখগুলোর পাঠোদ্ধার করেন।

অশোক-পরবর্তী সময়কালের লেখগুলোকে সরকারি ও ব্যক্তিগত– এ দুই শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। সরকারি লেখগুলো সাধারণত প্রশস্তিমূলক বা ভূমিদান সম্পর্কিত। রাজকবিদের দ্বারা রচিত প্রশস্তি হচ্ছে রাজাদের গুণকীর্তন যার বিখ্যাত দৃষ্টান্ত হচ্ছে এলাহাবাদ প্রশস্তি। এর রচয়িতা ছিলেন হরিষেণ এবং এতে সমুদ্রগুপ্তের রাজ্যবিজয় ও ব্যক্তিগত গুণাবলীর উল্লেখ রয়েছে। এলাহাবাদ প্রশস্তি আংশিক গদ্য ও আংশিক পদ্যে রচিত এবং এর ভাষা হচ্ছে সংস্কৃত। এ ধরনের প্রশস্তিমূলক অন্যান্য লেখের মধ্যে কলিঙ্গরাজ খরবেলের হাতিগুম্ফ লিপি, শকক্ষত্রপ রুদ্রদমনের জুনাগড় লিপি, চালুক্যরাজ দ্বিতীয় পুলকেশীর অইহোল লিপি, এবং বিজয়সেনের আমলের দেওপাড়া প্রশস্তি উল্লেখযোগ্য।

সরকারি লিপির মধ্যে অধিকাংশই হচ্ছে ভূমিদান সম্পর্কিত যা থেকে দান বা বিক্রির মাধ্যমে ভূমি হস্তান্তরের কথা জানা যায়। ভূমিদান সম্পর্কিত এ লেখগুলোর অধিকাংশই তামারপাতে উৎকীর্ণ বলে এগুলোকে সাধারণভাবে তাম্রশাসন বলে আখ্যায়িত করা হয়। এ ধরনের কিছু কিছু লেখ কচিৎ প্রস্তর বা মন্দিরের দেওয়ালেও উৎকীর্ণ দেখা যায়। এ লেখগুলো থেকে হস্তান্তরিত ভূমির সীমানা, দানের উদ্দেশ্য ও শর্তাবলী, জমির মূল্য, জমি মাপার একক ইত্যাদি বিষয়ে জানা যায়। অনেকগুলো তাম্রশাসনে দাতা বংশের বিবরণ এবং শাসনকারী রাজার জীবনী ও কৃতিত্বের বিবরণও থাকে যেমনটি রয়েছে ধর্মপালের খালিমপুর তাম্রশাসনে। ভূমিদান সম্পর্কিত এ তাম্রশাসনগুলো অর্থনৈতিক ইতিহাস সম্পর্কে তথ্য সরবরাহ করা ছাড়াও রাজনৈতিক, ধর্মীয় ইত্যাদি অন্যান্য বিষয়েও জানতে সাহায্য করে।

প্রশস্তিমূলক লেখগুলো অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে বিচার-বিশ্লেষণ করে সেগুলো থেকে তথ্য আহরণ করা প্রয়োজন।

প্রশস্তিমূলক লেখগুলো অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে বিচার-বিশ্লেষণ করে সেগুলো থেকে তথ্য আহরণ করা প্রয়োজন। প্রশস্তি রচয়িতাগণ রাজকবি হওয়ায় তাদের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল রাজার গুণকীর্তণ ও তুষ্টি বিধান। ফলে জীবন-চরিতগুলোর মত প্রশস্তিগুলোতে অতিরঞ্জন বা সত্যগোপনের সম্ভাবনা থাকে।

সরকারি লেখের সংখ্যা খুব বেশি নয়। সে তুলনায় ব্যক্তিগত বা বেসরকারি লেখের সংখ্যা অনেক। এগুলো দুই বা তিন শব্দের ছোট লিপি থেকে দীর্ঘ কবিতাও হতে পারে। ধর্মীয় উদ্দেশ্যে দানের ক্ষেত্রে এ লিপিগুলো মূর্তির গায়ে বা মন্দিরের দেওয়ালে উৎকীর্ণ করা হয়ে থাকে। এগুলো এসব মূর্তি ও মন্দিরের কাল নিরূপণ এবং শিল্প ও ধর্মের বিকাশ ও বিবর্তন নির্ধারণে আমাদের সাহায্য করে। একই ভাবে লিপিগুলোর ভাষা ও

লিপি রাজনৈতিক ইতিহাস পুনর্গঠনের প্রধান উৎস এবং সামাজিক, ধর্মীয় ও অর্থনৈতিক ইতিহাস জানার জন্য সাহিত্যিক উৎসের পরিপূরক হিসাবে যথেষ্ট মূল্যবান।

রচনাশৈলী ভারতীয় ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাসের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ। গুপ্তযুগের আগে পর্যন্ত যে লেখগুলো আমরা পেয়েছি তার প্রায় ৯৫% প্রাকৃত ভাষায় লেখা এবং বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম সম্পর্কিত। কিন্তু গুপ্তযুগ থেকে পরবর্তীকালে উৎকীর্ণ লিপিগুলোর ৯৫%টিই সংস্কৃত ভাষায় লেখা এবং এগুলো হিন্দু ধর্ম সম্পর্কিত। এ থেকে এটা স্পষ্ট যে গুপ্তযুগে সাহিত্যের মাধ্যম হিসাবে সংস্কৃত ভাষার এবং ধর্মের ক্ষেত্রে হিন্দু ধর্মের ব্যাপক প্রসার ঘটেছিল। তাছাড়া এসব বেসরকারি লিপিতে অনেক সময়ই সমকালীন রাজার নাম ও তারিখ উলে- খ করা থাকে যা রাজনৈতিক ইতিহাস পুনর্গঠনের ক্ষেত্রে আমাদের সাহায্য করে।

সুতরাং এতে কোন সন্দেহ নেই যে লিপি রাজনৈতিক ইতিহাস পুনর্গঠনের প্রধান উৎস এবং সামাজিক, ধর্মীয় ও অর্থনৈতিক ইতিহাস জানার জন্য সাহিত্যিক উৎসের পরিপূরক হিসাবে যথেষ্ট মূল্যবান।

মুদ্রা

ইতিহাসের উৎস হিসাবে লিপির পরেই মুদ্রার স্থান। প্রাচীন আমলের অসংখ্য মুদ্রা পাওয়া গেছে। দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা জানার জন্য মুদ্রা যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তা বলাই বাহুল্য। তবে দেশের রাজনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে জানতেও মুদ্রা আমাদের সাহায্য করে। মুদ্রা থেকে মুদ্রানীতি, ধাতুশিল্পের উন্নতি, শিল্প-নিপুণতা, রাজাদের আচার-আচরণ, ধর্মীয় বিশ্বাস, সঙ্গীতানুরাগ ইত্যাদি সম্পর্কেও ধারণা পাওয়া যায়।

প্রাচীন ভারতের প্রাথমিক মুদ্রাগুলোতে শুধু ছবি বা চিহ্ন অঙ্কিত থাকত, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সেগুলোতে লেখা না থাকায় এগুলোর প্রবর্তক বা সময়কাল সম্পর্কে কিছু জানা যায় না। মৌর্য সাম্রাজ্যের পতনের পর গ্রিকদের উত্তর-পশ্চিম ভারতে রাজ্য বিস্তারের সময় থেকেই আমরা রাজার নামাঙ্কিত এবং কখনো তাঁর নাম সম্বলিত মুদ্রা পাই। এ ধরনের মুদ্রা থেকেই জানা যায় যে ত্রিশজন গ্রিক রাজা ও রানী ভারতে শাসন করেছিলেন, যদিও সাহিত্যিক উৎসে পাওয়া যায় মাত্র চার-পাঁচ জনের নাম। গ্রিকদের পরে আক্রমণকারী হিসাবে ভারতে আগত শক ও পহ্লবদের মুদ্রাও গুরুত্বপূর্ণ। শকদের এক শাখা বহুদিন ধরে গুজরাট ও কাথিয়াওয়াড়ে রাজত্ব করেছিল এবং তাদের মুদ্রায় সুপরিচিত শকাব্দে তারিখও পাওয়া যায়। পরবর্তীকালের কুষাণদেরও অনেক মুদ্রা পাওয়া যায়, তবে কুষাণদের ইতিহাস অন্যান্য উৎস থেকেও জানা যায়।

গুপ্তবংশীয় সম্রাটগণ বেশ কয়েক ধরনের অত্যন্ত সুন্দর মুদ্রা প্রচলন করেছিলেন। লিপি এবং অন্যান্য উৎস থেকে তাঁদের সম্পর্কে বিস্তারিত জানা গেলেও এ মুদ্রাগুলো থেকে সেকালের বিভিন্ন বিষয়ে বহু তথ্য পাওয়া যায়। চন্দ্রগুপ্ত-কুমারদেবী রীতির মুদ্রা থেকে তাঁদের বিয়ে এবং লিচ্ছবিদের রাজনৈতিক গুরুত্বের ধারণা পাওয়া যায়। সমুদ্রগুপ্তের বিভিন্ন ধরনের মুদ্রা তাঁর সামরিক সাফল্য, শিকার প্রিয়তা, অশ্বমেধ যজ্ঞ অনুষ্ঠান ও সঙ্গীতে পারদর্শিতার প্রমাণ দেয়। এলাহাবাদ প্রশস্তিতে হরিষেন সমুদ্রগুপ্তের গুণাবলীর যে বর্ণনা দিয়েছেন এসব মুদ্রা থেকে তার সমর্থন পাওয়া যায়।

পরবর্তীকালে ভারতে রাজত্বকারী বিভিন্ন বংশের রাজারা বহু মুদ্রা প্রবর্তন করেছিলেন। কিন্তু অন্যান্য উৎস থেকে তাঁদের রাজত্বকালের বিস্তারিত তথ্য পাওয়া যায় বিধায় তাঁদের মুদ্রা উৎস হিসাবে তেমন গুরুত্বপূর্ণ বিবেচিত হয় না।

সৌধ, স্মৃতিস্তম্ভ

লিপি ও মুদ্রা ছাড়াও অট্টালিকা, মূর্তি, মৃৎশিল্প ইত্যাদির আকারেও আমরা প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদান পাই। এগুলো থেকে ভারতীয় শিল্পকলার বিবর্তন সম্পর্কে জানা যায়। কখনো প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধানে আমরা পেয়ে যাই কোন প্রাচীন শহরের ধ্বংসাবশেষ। মহেঞ্জোদারো ও হরপ্পার ধ্বংসাবশেষ থেকে ভারতীয় সভ্যতার প্রাচীনতম নিদর্শন পাওয়া যায়। এ শহর দুটির ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কারের ফলে ভারতীয় সভ্যতার সময়কাল সহস্রাধিক বছর পিছিয়ে গেছে।অর্থাৎ আগে যেখানে আমাদের ধারণা ছিল যে খ্রিস্টপূর্ব ১৫০০ অব্দে

আর্যদের ভারতে আগমনের সময়কাল থেকে ভারতীয় সভ্যতার শুরু হয়েছিল এখন এ আবিষ্কারের ফলে দেখা যাচ্ছে যে ভারতীয় সভ্যতার উন্মেষ ঘটেছিল তারও প্রায় সহস্রাধিক বছর আগে।

মহেঞ্জোদারো ও হরপ্পার ধ্বংসাবশেষ থেকে ভারতীয় সভ্যতার প্রাচীনতম নিদর্শন পাওয়া যায়। এ শহর দুটির ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কারের ফলে ভারতীয় সভ্যতার সময়কাল সহস্রাধিক বছর পিছিয়ে গেছে।

তক্ষশীলা, সারনাথ, নালন্দা, পাহাড়পুর, মহাস্থানগড়, ময়নামতি প্রভৃতি স্থানে প্রত্নতাত্ত্বিক খননকার্যের ফলে ভারতীয় ইতিহাসের বিভিন্ন পর্যায় সম্পর্কে নতুন জ্ঞান লাভ করা সম্ভব হয়েছে। এসব প্রত্নতাত্ত্বিক খননকার্যের ফলে সেই যুগের জনগণের জীবনযাত্রা, ধর্মবিশ্বাস, শিল্পকলা, স্থাপত্য ইত্যাদি সম্পর্কে আমরা জানতে পারি।

(গ) বিদেশীদের বিবরণ

সাহিত্যিক ও প্রত্নতাত্ত্বিক উৎস ছাড়াও আমাদের কাছে প্রাচীন ভারতের ইতিহাস পুনর্গঠনের অন্য এক ধরনের উৎস রয়েছে। বিভিন্ন সময়ে বিদেশীরা ভারতবর্ষ সম্পর্কে বিবরণ লিখেছিলেন। তাঁদের মধ্যে কেউ এ দেশে এসে তাঁদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার আলোকে এবং কেউ এদেশে না এসেও লোকমুখে শুনে ভারতবর্ষ সম্পর্কে তাঁদের বিবরণ লিখেছিলেন।

বিভিন্ন সময়ে বিদেশীরা ভারতবর্ষ সম্পর্কে বিবরণ লিখেছিলেন। তাঁদের মধ্যে কেউ এ দেশে এসে তাঁদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার আলোকে এবং কেউ এদেশে না এসেও লোকমুখে শুনে ভারতবর্ষ সম্পর্কে তাঁদের বিবরণ লিখেছিলেন।

ভারতবর্ষ সম্পর্কে যাঁদের বিবরণ পাওয়া যায় তাঁদের মধ্যে সবচেয়ে প্রথম উল্লেখ করতে হয় হেরোডোটাস ও টেসিয়াসের নাম। দুজনের একজনও এদেশে আসেন নি। জনশ্রুতি এবং অন্যান্য উৎসের ওপর ভিত্তি করে তাঁরা তাঁদের বিবরণ লিখেছিলেন।

গ্রিক ঐতিহাসিক হেরোডোটাস (আনুমানিক ৪৮৪-৪৩১ খ্রিস্টপূর্বাব্দ) তদানীন্তন পারস্য সাম্রাজ্যের অন্তর্গত এশিয়া মাইনরের দক্ষিণ-পশ্চিম উপকূলে জন্মগ্রহণ করেন। ইতিহাসের জনক হিসাবে পরিচিত হেরোডোটাসের সবচেয়ে বিখ্যাত গ্রন্থ হচ্ছে 'হিস্ট্রি'। তিনি কখনও ভারতবর্ষে আসেন নি, তবে তিনি জানতেন যে ভারতবর্ষ তখন পারস্য সাম্রাজ্যের অন্তর্গত একটি প্রদেশ ছিল। তাঁর বিবরণে ভারতবর্ষ সম্পর্কে কিছু প্রয়োজনীয় তথ্য পাওয়া যায়।

টেসিয়াস (খ্রিস্টপূর্ব পঞ্চম শতকে জন্ম) বিশ বছর (৪১৮-৩৯৮ খ্রিস্টপূর্ব) পারস্যের রাজা আর্টাজারেক্সের চিকিৎসক ছিলেন। ভারতবর্ষ সম্পর্কে তিনি একটি বিবরণ লিখেছিলেন যা খন্ডিত আকারে পরবর্তী লেখকদের রচনার মাধ্যমে আমাদের কাছে এসেছে। রলিনসন যথার্থই বলেছেন যে টেসিয়াসের ইন্ডিকা "দানব সদৃশ্য মানুষের ও অদ্ভুত জীবজন্তুর অসংযত গল্পে ভরপুর। এটা থেকে ভারত সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান বৃদ্ধি পায় না।"

আলেকজান্ডারের ভারত অভিযানের সময় তাঁর সঙ্গীদের মধ্যে তিনজন– নিয়ারকস, অ্যারিস্টোবোলাস এবং অনেসিক্রিটাস ভারতবর্ষ সম্পর্কে বিবরণ লিখেছিলেন। নিয়ারকস সমুদ্রপথে দেশে ফিরেছিলেন এবং তাঁর বিবরণে সমুদ্রপথের এবং ভারতীয় বন্দর, আমদানী-রপ্তানী দ্রব্য এবং ব্যবসা-বাণিজ্যের বিস্তারিত বর্ণনা রয়েছে। তাঁর বিবরণ থেকেই ভারতের জাহাজ-নির্মাণ শিল্প ও ভারতীয় বণিকদের পশ্চিম সাগরপথে বাণিজ্যের উল্লেখ পাওয়া যায়। আলেকান্ডারের অপর সঙ্গী অ্যারিস্টোবোলাস শেষ জীবনে তাঁর অভিজ্ঞতার কাহিনী লিখেছিলেন। অনেসিক্রিটাস সমুদ্র যাত্রায় নিয়ারকসের সঙ্গী ছিলেন এবং তিনিও একটি বিবরণ লিখেছিলেন। নিয়ারকস সিন্ধু নদ থেকে ইউফ্রেটিস নদী পর্যন্ত জলপথে গিয়েছিলেন।

বিদেশীদের মধ্যে ভারতবর্ষ সম্পর্কে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিবরণ লিখেছিলেন চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের দরবারে আগত গ্রিক রাষ্ট্রদূত মেগাস্থিনিস।

বিদেশীদের মধ্যে ভারতবর্ষ সম্পর্কে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিবরণ লিখেছিলেন চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের দরবারে আগত গ্রিক রাষ্ট্রদূত মেগাস্থিনিস। তিনি ভারতে আট বছর অবস্থান করেছিলেন এবং মৌর্য সম্রাটের শাসনব্যবস্থা প্রত্যক্ষ করেছিলেন। তাঁর রচিত 'ইন্ডিকা' বর্তমানে সম্পূর্ণ অবস্থায় পাওয়া না গেলেও পরবর্তীকালের লেখকদের রচনায় উদ্ধৃতির আকারে ইন্ডিকার বিষয়বস্তু প্রচুর স্থান পেয়েছে। পরবর্তীকালে স্ট্র্যাবো (খ্রিঃ পূঃ ৬৩-২১ খ্রিঃ), ডায়াডোরাস (খ্রিঃপূঃ ৬৯-১৬ খ্রিঃ) এবং অ্যারিয়ান (খ্রিস্টিয় ২য় শতক) ইন্ডিকার ওপর ভিত্তি করেই তাঁদের বিবরণ লিখেছিলেন। মেগাস্থিনিস পুরুর সঙ্গেও সাক্ষাত করেছিলেন।

গ্রিক ভূগোলবিদ স্ট্র্যাবো (জন্ম আনুমানিক ৬৩ খ্রি:পূ:) লিখেছিলেন ভূগোল। ভারতের ভৌগোলিক অবস্থা জানার জন্য তাঁর গ্রন্থটি অত্যন্ত মূল্যবান। গ্রিক ঐতিহাসিক অ্যারিয়ান (আনুমানিক ৯৬-১৮০ খ্রি:) আলেকজান্ডারের জীবনী রচনা করেছিলেন। তিনি নিজেই স্বীকার করেছেন যে অ্যারিস্টোবোলাসের রচনা থেকে তিনি তাঁর উপাত্ত সংগ্রহ করেছিলেন। মেগাস্থিনিসের ইন্ডিকার ভিত্তিতে তিনি ভারতের বর্ণনা দিয়েছেন। অ্যারিয়ান পুরুর সঙ্গে আলোকজান্ডারের সাক্ষাতের এবং তাঁদের আলোচনার বিবরণ দিয়েছেন।

ভারতের ভৌগোলিক অবস্থা ও প্রাকৃতিক ইতিহাস যাঁরা বর্ণনা করেছেন তাঁদের বিবরণও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাদের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন পেরিপ্লাস অফ দি ইরিথ্রিয়ান সী নামক গ্রন্থের অজ্ঞাতনামা লেখক। লেখকের নাম উল্লেখিত না হলেও গ্রন্থের অভ্যন্তরীণ সাক্ষ্য থেকে জানা যায় যে তিনি ছিলেন জাতিতে গ্রিক। তিনি মিশরে বাস করতেন এবং নিজেও সক্রিয়ভাবে ব্যবসার সঙ্গে জড়িত ছিলেন। এ ব্যবসা উপলক্ষেই ৮০ খ্রিস্টাব্দের দিকে তিনি সমুদ্রপথে লোহিত সাগর দিয়ে ভারতে এসেছিলেন। ফলে পশ্চিমা দেশগুলোর সঙ্গে ভারতীয় বাণিজ্যের প্রাথমিক অবস্থা সম্পর্কে জানার জন্য তাঁর বিবরণ অত্যন্ত মূল্যবান ও নির্ভরযোগ্য একটি উৎস।তাঁর গ্রন্থটি রচিত হয়েছিল খ্রিস্টিয় প্রথম শতাব্দীর শেষার্ধে। তাঁর বিবরণ থেকে ভারতীয় বন্দর, পোতাশ্রয় এবং বাণিজ্য সামগ্রী সম্পর্কে জানা যায়।

রোমান ঐতিহাসিক প্লিনির (২৩-৭৯ খ্রি:) রচিত গ্রন্থের নাম 'প্রকৃতির ইতিহাস'। ভারতের জীবজন্তু, গাছপালা এবং খনিজ সম্পদ সম্পর্কে বিবরণ রয়েছে এ গ্রন্থে। গ্রিক লেখক এবং ব্যবসায়ীদের প্রতিবেদনের ওপর ভিত্তি করে প্লিনি তাঁর গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। প্লুটার্ক (আনুমানিক ৪৬-১২০ খ্রি:) জন্মগ্রহণ করেন গ্রিসে। তিনি গ্রিস ও রোমের বিখ্যাত ব্যক্তিদের জীবনী রচনা করেছিলেন। আলেকজান্ডারের জীবনী আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি আলেকজান্ডারের ভারত অভিযানের বর্ণনা দিয়েছেন তাঁর গ্রন্থে। খ্রিস্টিয় দ্বিতীয় শতকে টলেমী ভারতের ভৌগোলিক বিবরণ লিখেছিলেন। তিনি ছিলেন একাধারে অঙ্কশাস্ত্রবিদ, সঙ্গীতজ্ঞ, জ্যোতির্বিদ ও ভূগোলবিদ। পরোক্ষ উৎস থেকে নেওয়া বিধায় তাঁর তারিখগুলো সব ক্ষেত্রে নির্ভুল নয়।

গ্রিক ও রোমান লেখকদের পর ভারত সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাওয়া যায় চৈনিক পরিব্রাজকদের বিবরণে।

গ্রিক ও রোমান লেখকদের পর ভারত সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাওয়া যায় চৈনিক পরিব্রাজকদের বিবরণে। তাঁদের মধ্যে তিনজন সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। এরা হচ্ছেন ফা-হিয়েন (৩৯৯-৪১৪ খ্রি:), হিউয়েন সাং (৬৩০-৬৪৫ খ্রি:) এবং ইৎ-সিং (৬৭১-৬৯৫ খ্রি:)। এরা প্রত্যেকেই দীর্ঘদিন ভারতে অবস্থান করেছিলেন এবং ভারতীয় ভাষা শিখেছিলেন। তাঁরা ভারতের বিভিন্ন এলাকা ভ্রমণ করেছিলেন। কিন্তু তাঁরা সবাই ছিলেন বৌদ্ধ ভিক্ষু এবং তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল ধর্মীয়। তাঁদের ভারতে আগমন ও ভ্রমণের উদ্দেশ্য ছিল বৌদ্ধ পূণ্যস্থানগুলো দর্শন এবং বৌদ্ধধর্ম সম্পর্কিত পুস্তক সংগ্রহ করা। ফা-হিয়েন এবং ইৎ-সিং প্রসঙ্গক্রমে মাঝে মাঝে পার্থিব বিষয়ের উল্লেখ করেছেন। যে সকল রাজ্য তাঁরা ভ্রমণ করেছিলেন সেগুলোর রাজাদের নাম পর্যন্ত তাঁরা উল্লেখ করেন নি। হিউয়েন সাং অবশ্য এতটা সীমাবদ্ধ নন এবং তিনি তাঁর পৃষ্ঠপোষক সম্রাট হর্ষবর্ধন এবং অন্যান্য ভারতীয় নৃপতিদের সম্পর্কে কিছু তথ্য দিয়েছেন। যেসব রাজ্যে হিউয়েন সাং গিয়েছিলেন সেগুলোর রাজনৈতিক অবস্থাও তিনি বর্ণনা করেছেন। তবে তাঁর বিবরণও ফা-হিয়েন এবং ইৎ-সিং এর বিবরণের মত ভারতে বৌদ্ধ ধর্মের অবস্থার বিশদ বিবরণে ভরপুর। তাঁরা বৌদ্ধ ধর্মের ধর্মানুষ্ঠান, আচারাদি, পূন্যস্থান, মন্দির, স্মৃতিস্তম্ভ, বিভিন্ন সম্প্রদায়, মতবাদ ইত্যাদি বিষয়গুলোর পুঙ্খানুপুঙ্খ ও বিস্তারিত বর্ণনা দিয়েছেন। কিন্তু বৌদ্ধ ভিক্ষু হওয়ায় এবং তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গি ও মানসিকতা ধর্মীয় হওয়ায় তাঁদের বিবরণ রাজনৈতিক ইতিহাস পুনরুদ্ধারে বিশেষ কোন কাজে আসে না। তাঁরা সব কিছুই বৌদ্ধ ধর্মের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখার ফলে তাঁদের বিবরণ সতর্কতার সাথে দেখা প্রয়োজন। প্রধানত শুধুমাত্র বৌদ্ধ মঠ, মন্দির পরিদর্শন ও বৌদ্ধ ভিক্ষুদের সঙ্গে মেলামেশা করার কারণে তাঁদের বিবরণে অনেক ভুল উক্তি রয়েছে। যেমন ফা-হিয়েন বলেছেন যে, ভারতীয়রা মাছ-মাংস খায় না, তারা নিরামিষাশী এবং কড়ি হচ্ছে তাদের একমাত্র বিনিময় মাধ্যম। দুটি তথ্যই ভুল, কেননা গুপ্তযুগে প্রচুর স্বর্ণমুদ্রা প্রচলিত ছিল এবং মানুষ মাছ-মাংসও খেত। সে আমলের বিভিন্ন ধরনের স্বর্ণমুদ্রা আমাদের হাতে এসেছে। সে আমলে ভারতীয়রা যে মাছ-মাংস খেত সে রকম বর্ণনাও সমসাময়িক বহু গ্রন্থে রয়েছে। সীমিত এলাকায় বিচরণ এবং বৌদ্ধ ভিক্ষুদের সঙ্গে থাকার ফলেই তাঁর মনে এ ভুল ধারণার সৃষ্টি হয়েছিল। কারণ, বৌদ্ধ ভিক্ষুরা নিরামিষাশী

এবং তাদের দৈনন্দিন প্রয়োজন অতি সামান্য হওয়ায় কড়ি দিয়েই তারা প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র কিনতে পারতেন।

খ্রিস্টিয় অষ্টম শতাব্দী থেকে আরব লেখকদের দৃষ্টি ভারতের দিকে আকৃষ্ট হয়। বহুকাল আগে থেকেই ভারতের সঙ্গে আরবদের বাণিজ্যিক সম্পর্ক ছিল। আরব নাবিক ও বণিকদের বিবরণ ছাড়াও খ্রিস্টিয় অষ্টম শতকের প্রথম দিকে আরবদের সিন্ধু বিজয়ের ফলে আরবদের রচিত ঐতিহাসিক ঘটনাপঞ্জিতেও ভারত গুরুত্বপূর্ণস্থান লাভ করে। যে সকল আরব লেখক ভারতবর্ষ সম্পর্কে বিবরণ লিখেছেন তাঁদের মধ্যে সুলেমান (মৃত্যু ৮৫১ খ্রিঃ), ইবনে খুর্দাদবে (মৃত্যু ৯১২ খ্রিঃ), আল-মাসুদী (মৃত্যু ৯৫৬ খ্রিঃ), ইদ্রিসী (একাদশ শতকের শেষ ভাগে জন্ম) উল্লেখযোগ্য। সুলেমান পাল বংশের রাজা দেবপালের রাজত্বকালে ভারতে এসেছিলেন। ৯১৫ খ্রিস্টাব্দে আল-মাসুদী প্রতীহার রাজ্যে এসেছিলেন।

তাঁরা সব কিছুই বৌদ্ধ ধর্মের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখার ফলে তাঁদের বিবরণ সতর্কতার সাথে দেখা প্রয়োজন।

আরবি ভাষায় ভারত সম্পর্কে গ্রন্থ রচয়িতাদের মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত হচ্ছেন আল-বেরুনী। তাঁর আসল নাম হচ্ছে আবু রায়হান মুহাম্মদ বিন আহমদ। এক ইরানি পরিবারে ৯৭৩ খ্রিস্টাব্দে তাঁর জন্ম হয়েছিল। আল-বেরুনী তাঁর 'তাহকিক-ই-হিন্দ' রচনা শেষ করেন ১০৩০ খ্রিস্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে, সুলতান মাহমুদের মুত্যুর পাঁচ মাসের মধ্যে। তাঁর এ গ্রন্থ 'কিতাবুল-হিন্দ' রূপেও পরিচিত। সুলতান মাহমুদের সঙ্গে ভারতবর্ষে এসে তিনি সংস্কৃত ভাষা শিখেন এবং ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতি সম্পর্কে জ্ঞান আহরণ করেন। বিভিন্ন বিষয়ে প্রচুর বই পড়ে ভারতীয় সংস্কৃতি সম্পর্কে তাঁর যে ধারণা জন্মেছিল সেটাই তিনি লিপিবদ্ধ করেছেন তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থে। আল-বেরুনী ধর্মান্ধতা থেকে মুক্ত ছিলেন এবং তাঁর কোন জাত্যাভিমানও ছিলনা। তিনি মুসলমান, ইসলামের শ্রেষ্ঠতার কথাও তিনি বলেছেন, কিন্তু হিন্দুদের প্রতি তাঁর ঘৃণা ছিল না। তাদের কুসংস্কার, অন্ধবিশ্বাস, মূর্খতা, আত্মম্ভরিতা, সঙ্কীর্ণতা ইত্যাদির তিনি নিন্দা করেছেন। কিন্তু যেখানে তাদের কৃতিত্ব ও মহৎ চিন্তার পরিচয় পেয়েছেন সেখানে সংক্ষেপে হলেও তাদের প্রশংসা করেছেন।

প্রাচীন ভারতের সাংস্কৃতিক ইতিহাস রচনার জন্য আল-বেরুনীর গ্রন্থটি একটি মূল্যবান আকরগ্রন্থ। তবে গ্রন্থের ত্রুটিও রয়েছে। প্রথমত, তিনি ভারতের রাজনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে তেমন কিছু বলেননি। ফলে রাজনৈতিক ইতিহাস পুনর্গঠনে এ গ্রন্থ আমাদের কোন সাহায্য করে না। দ্বিতীয়ত, তিনি তাঁর বই লিখেছিলেন ভারতীয় ভাষায় লেখা বিভিন্ন বিষয়ে বহু বই পড়ে। তাঁর গ্রন্থে ভারতের গণিত, পদার্থবিদ্যা, রসায়ন, জ্যোতির্বিদ্যা, জ্যোতিষশাস্ত্র, ভূগোল, দর্শন, ধর্মীয় ও সামাজিক রীতিনীতি সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যায়। কিন্তু এসব বিবরণ দিয়েছিলেন তিনি বই পড়ে, নিজের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে নয়। অন্যভাবে বলা যেতে পারে যে তিনি ভারতকে দেখেছিলেন বই এর মাধ্যমে, নিজের চোখে নয়। স্মিথ মনে করেন যে প্রায় পাঁচশত বছর পরে আবুল ফজল কোন স্বীকারোক্তি ছাড়াই তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ আইন-ই-আকবরীর আদর্শ হিসাবে তাহকিক-ই-হিন্দকে গ্রহণ করেছিলেন।

প্রাচীন ভারতের সভ্যতা-সংস্কৃতি, রীতিনীতি, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, ধর্মীয় ও সামাজিক অবস্থা সম্পর্কে বিদেশীদের বিবরণে যথেষ্ট তথ্য পাওয়া যায়। কিন্তু এসব বিবরণ ব্যবহারে সতর্কতা অবলম্বন করা অত্যন্ত প্রয়োজন, কারণ তাঁদের বর্ণনায় তাঁদের নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি প্রাধান্য পেয়েছে। তাছাড়া অতিশয়োক্তি, প্রকৃত অবস্থা জানার অসুবিধা, লোকমুখে শুনে বিবরণ লেখা, সীমিত পরিসরে এবং সমাজের বিশেষ শ্রেণীর সঙ্গে বসবাস, স্থানীয় ভাষাজ্ঞানের অভাব প্রভৃতি কারণে তাঁদের বর্ণনায় যথেষ্ট ভুল থাকার সম্ভাবনা থাকে। তবুও অন্যান্য উৎস দ্বারা এসব বিবরণ যাচাই করে এগুলো থেকে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ উপাত্ত সংগ্রহ করে প্রাচীন ভারতের নির্ভরযোগ্য ইতিহাস রচনা করা সম্ভব।

সারসংক্ষেপ

প্রাচীন ভারতের ইতিহাস পুনর্গঠন সহজসাধ্য নয়। এর প্রধান কারণ, প্রাচীন ভারতে ইতিহাস সম্পর্কে লিখিত কোনো গ্রন্থ পাওয়া যায় না। ফলে আমাদের অন্যান্য উৎসের সন্ধান করতে হয়। প্রাপ্ত উৎসসমূহকে প্রধানত তিনভাগে ভাগ করা যায়– সাহিত্যিক উৎস, প্রত্নতাত্ত্বিক উৎস ও বিদেশীদের বিবরণ। সাহিত্যিক উৎসের মধ্যে বেদ, রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ ছাড়াও পাণিনির অষ্টাধ্যায়ী, কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র, বাণভট্টের হর্ষচরিত, সন্ধ্যাকর নন্দীর রামচরিত, কলহণের রাজতরঙ্গিনী ইত্যাদি গ্রন্থ উল্লেখযোগ্য। তন্মধ্যে আধুনিক বিচারে বিজ্ঞানসম্মত ইতিহাস বলা যায় শেষোক্ত গ্রন্থটিকে। প্রত্নতাত্ত্বিক উৎসের মধ্যে রয়েছে লেখ বা লিপি, মুদ্রা, সৌধ ও স্মৃতিস্তম্ভ। গ্রিক, রোমান লেখক, চৈনিক পরিব্রাজক, আরব নাবিক, বণিক ও লেখকদের বিবরণও প্রাচীন ভারতের ইতিহাস পুনর্গঠনের গুরুত্বপূর্ণ উৎস। এই বিবরণগুলোকে দুটি ভাগে ভাগ করা যায়– প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার আলোকে লিখিত এবং জনশ্রুতি অথবা অন্যান্য উৎসের ভিত্তিতে লিখিত। সর্বশেষে বলা যায়, উপর্যুক্ত তিন ধরনের উৎস ত্রুটিমুক্ত নয়। তবে এসব উৎসে প্রাপ্ত তথ্যসমূহ বিচার-বিশ্লেষণ করে প্রাচীন ভারতের সভ্যতা, সংস্কৃতি, রীতিনীতি, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ধর্মীয় অবস্থার নির্ভরযোগ্য ইতিহাস রচনা সম্ভব।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন ঃ

সঠিক উত্তরের পাশে টিক ($\surd$) চিহ্ন দিন।

১. অর্থশাস্ত্র কে লিখেছেন ?
   (ক) সন্ধ্যাকর নন্দী (খ) কল্‌হণ
   (গ) কৌটিল্য (ঘ) হরিষেণ

২. ইন্ডিকার লেখক কে ?
   (ক) মেগাস্থিনিস (খ) বাণভট্ট
   (গ) ফা-হিয়েন (ঘ) স্ট্র্যাবো

৩. কল্‌হণ লিখেছেন-
   (ক) রামচরিত (খ) হর্ষচরিত
   (গ) রাজতরঙ্গিনী (ঘ) বেদ

৪. ফা-হিয়েন ছিলেন-
   (ক) সম্রাট (খ) সেনাপতি
   (গ) পরিব্রাজক (ঘ) মন্ত্রী

৫. ভারতে প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল-
   (ক) বেন্টিঙ্ক (খ) ডালহৌসী
   (গ) কার্জন (ঘ) মিন্টো-এর আমলে।

৬. অশোকের লিপির প্রথম পাঠোদ্ধার করেছিলেন-
   (ক) স্যার জন মার্শাল (খ) রাখাল দাস বন্দ্যোপাধ্যায়
   (গ) জেমস প্রিন্সেপ (ঘ) আহমদ হাসান দানী

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ঃ

১। প্রাচীনকালে ভারতীয় পন্ডিতগণ কেন ইতিহাস গ্রন্থ রচনা করেননি?
২। প্রাচীন ভারতের ইতিহাস পুনর্গঠনে মুদ্রা কতটুকু সহায়ক?
৩। প্রাচীন ভারতের ইতিহাস পুনর্গঠনকালে চৈনিক পরিব্রাজকদের বিবরণকেন সতর্কতার সাথে অবলম্বন করা প্রয়োজন?
৪। 'কিতাবুল-হিন্দ' সম্পর্কে একটি টীকা লিখুন।

রচনামূলক প্রশ্ন ঃ

১. প্রাচীন ভারতের ইতিহাস পুনর্গঠনের সাহিত্যিক উৎসগুলো আলোচনা করুন।
২. প্রাচীন ভারতের ইতিহাস পুনর্গঠনের প্রত্নতাত্ত্বিক উৎসগুলোর মূল্যায়ন করুন।
৩. প্রাচীন ভারতের ইতিহাস রচনায় বিদেশীদের বিবরণ কতটুকু সহায়ক?

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

১। R.C. Majumdar, *The History and Culture of the Indian People*, Vol-1,*Vedic Age*.
৬। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, *প্রাচীন ভারতের ইতিহাস।*

পাঠ - ৩

উপমহাদেশের মুসলিম যুগের ইতিহাসের উৎস (প্রাক্-মুঘল আমল)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ পড়ে আপনি–

- সুলতানি আমলে ভারতের ইতিহাস পুনর্গঠনের বিভিন্ন উৎস সম্পর্কে জানতে পারবেন ;
- সমকালীন এবং পরবর্তীকালের ঐতিহাসিকদের লেখা গ্রন্থ ও অন্যান্য উৎসের মূল্যায়ন করতে পারবেন।

ভারত বিজয়ী তুর্কি মুসলমানরা ইতিহাস রচনার দক্ষতা নিয়ে এদেশে আসে। ফলে দিল্লিতে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠার সময় থেকে শুরু করে সুলতানি আমলে ও পরবর্তীকালে রচিত বহু ইতিহাস গ্রন্থ দেখা যায়। প্রফেসর ডডওয়েল বলেন, মুসলমান আমল শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ভারতে ধারাবাহিকভাবে ইতিহাস লেখা শুরু হয়, ফলে মুসলমান আমলের যেমন জীবন্ত চিত্র পাওয়া যায়, হিন্দু আমল তেমনই ছায়াছন্ন। দিল্লির সুলতানদের পৃষ্ঠপোষকতায় এবং অনেক সময় তাঁদের পৃষ্ঠপোষকতা ছাড়াই সুলতানি আমলে অনেক ইতিহাস গ্রন্থ রচিত হয়েছিল। এগুলোর সাহায্যে দিল্লির সুলতানদের ধারাবাহিক ইতিহাস রচনা করা তেমন কষ্টসাধ্য নয়। মুঘল আমলে সম্রাটগণ নিজ নিজ সময়ের বা পূর্ববর্তীকালের ইতিহাস রচনা করার জন্য ঐতিহাসিক নিযুক্ত করতেন। মুঘল যুগে রচিত বিভিন্ন ইতিহাস গ্রন্থ থেকেও সুলতানি আমলের ভারতবর্ষের ইতিহাস জানা যায়।

সুলতানি আমলের ভারতবর্ষের ইতিহাস পুনর্গঠনের উৎসগুলোকে তিন শ্রেণীতে ভাগ করা যায় :

(ক) সাহিত্যিক উপাদান (ইতিহাস ও অন্যান্য গ্রন্থ, সুফিদের জীবন-চরিত ও সুফিদের লেখা চিঠি-পত্র এবং তাঁদের আলোচনার বিবরণ),

(খ) বিদেশীদের বিবরণ এবং

(গ) সমসাময়িক শিলালিপি ও মুদ্রা।

(ক) সাহিত্যিক উপাদান ঃ

যে সব ঐতিহাসিকদের রচনা থেকে সুলতানি আমলে ভারতবর্ষের ইতিহাস জানা যায় তাঁরা হচ্ছেন:

হাসান নিজামি ঃ মুসলমানদের দিল্লি জয়ের অব্যহিত পরেই তিনি এদেশে আসেন। তিনি ছিলেন কুতুবউদ্দিন আইবকের সমসাময়িক। ১১৯২-১২২৮ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে সংঘটিত প্রধান সামরিক ঘটনাবলি তাঁর গ্রন্থ তাজুল মাসির-এ স্থান পেয়েছে। আইবকের রাজত্বকালের প্রথম দিকে তিনি তাঁর গ্রন্থ রচনা শুরু করেন। প্রধানত কুতুবউদ্দিন আইবককে নিয়ে রচিত হলেও তাজুল মাসির-এ মুহাম্মদ ঘোরী এবং ইলতুৎমিশেরও বিবরণ রয়েছে।

মিনহাজ-উস-সিরাজ ঃ তিনি ১২৬০ খ্রিস্টাব্দে তাঁর তাবাকাৎ-ই-নাসিরি রচনা করেন। এটা মুসলমান বিশ্বের ইতিহাস হলেও মুসলমানদের ভারত জয় এবং প্রাথমিক সুলতানি আমলের ইতিহাস রচনার জন্য একটি অত্যন্ত মূল্যবান উৎস। তাঁর গ্রন্থে বর্ণিত ঘটনাবলির তিনি শুধু সমসাময়িকই ছিলেন না, কিছু কিছু ঘটনায় তিনি অংশও নিয়েছিলেন। তিনি ছিলেন ধর্ম ও বিচার বিভাগীয় উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা। তিনি তাঁর গ্রন্থ সুলতান নাসিরউদ্দিন মাহমুদকে উৎসর্গ করেছিলেন এবং একারণেই তাঁর গ্রন্থের এ নাম।

আমীর খসরু ঃ সুলতান নাসিরউদ্দিন মাহমুদের রাজত্বকালে তিনি ১২৫৩ খ্রিস্টাব্দে উত্তর প্রদেশের পাতিয়ালিতে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা সাইফউদ্দিন মাহমুদ ছিলেন সুলতান ইলতুৎমিশের চাকুরিতে

নিয়োজিত একজন প্রবীন যোদ্ধা। আমীর খসরু পর্যায়ক্রমে ছয়জন সুলতানের রাজত্বকালের প্রত্যক্ষদর্শী ছিলেন। তাঁরা হচ্ছেন বলবন, কায়কোবাদ, জালালউদ্দিন খলজী, আলাউদ্দিন খলজী, কুতুবউদ্দিন মোবারক শাহ খলজী এবং গিয়াসউদ্দিন তুঘলক। বাল্যকালেই তিনি কবিতা লিখতে শুরু করেছিলেন। মূলত কবি হলেও আমীর খসরু মাঝে মাঝে তাঁর রচনার বিষয়বস্তু হিসাবে ঐতিহাসিক ঘটনাকে বেছে নিয়েছেন। ছয়জন সুলতানের সাহচর্য এবং উচ্চপদস্থ সামরিক ও বেসামরিক ব্যক্তি ও নিজামউদ্দিন আউলিয়ার সঙ্গে মেলামেশার ফলে রাজনৈতিক ঘটনাবলি ও সামাজিক অবস্থা সম্পর্কে নির্ভুল তথ্য আহরণের অনন্য সুযোগ তাঁর ছিল। কাজেই ইতিহাস রচনায় কখনো মনোনিবেশ না করলেও তাঁর রচনাবলী, বিশেষত তাঁর ঐতিহাসিক মসনভী ও দিওয়ানগুলো সমকালীন ইতিহাস সম্পর্কে যথেষ্ট আলোকপাত করে। আমীর খসরুর রচনাবলীর একটা বিশেষ প্রশংসনীয় দিক হচ্ছে- নির্ভরযোগ্য তারিখের প্রাচুর্য এবং সময়ানুক্রমের ব্যাপারেও তিনি জিয়াউদ্দিন বারাণীর চেয়ে অধিকতর নির্ভরযোগ্য। তাঁর রচনাবলীর মধ্যে নিম্নলিখিতগুলো ইতিহাসের উৎস হিসেবে বিশেষ উল্লেখযোগ্যঃ

(ক) কিরান-উস-সাদাইন ঃ বাংলার শাসনকর্তা বুঘরা খান ও তাঁর পুত্র দিল্লির সুলতান কায়কোবাদের সাক্ষাতের ঘটনা নিয়ে এ কাব্য রচিত। সরজু নদী-তীরে এ ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী ছিলেন আমীর খসরু। এটি রচিত হয়েছিল ১২৮৮ খ্রিস্টাব্দে। এটা দিল্লির সামাজিক জীবনের ওপরেও আলোকপাত করে। এ গ্রন্থে আমীরদের সামাজিক মেলামেশা ও কর্মকান্ড, জনপ্রিয় বাদ্যযন্ত্র, বিভিন্ন ধরনের নৌকা এবং উপাদেয় খাদ্যের বর্ণনা রয়েছে।

(খ) সিফতাহুল ফুতুহ ঃ এ গ্রন্থ জালালউদ্দিন ফিরোজ খলজীর সামরিক অভিযান, মালিক সাজ্জুর বিদ্রোহ দমন, সুলতানের রণথম্ভোরের দিকে অগ্রসর হওয়া এবং ব্যর্থ মোঙ্গল আক্রমণের বিবরণ রয়েছে।

(গ) খাজাইন-উল-ফুতুহ ঃ এ গ্রন্থ গদ্যে লেখা এবং এতে আলাউদ্দিন খলজীর দাক্ষিণাত্যে সাফল্যসমূহের বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে। আলাউদ্দিন খলজীর রাজত্বকাল সম্পর্কে এটাই একমাত্র সমসাময়িককালে লিখিত ইতিহাস। কারণ, বারাণীও তাঁর তারিখ-ই-ফিরোজশাহী লিখেছিলেন আলাউদ্দিন খলজীর মৃত্যুর বহুপরে। বাদাউনীর ভাষ্য অনুসারে আমীর খসরু দাক্ষিণাত্য অভিযানকালে মালিক কাফুরের সঙ্গে গিয়েছিলেন।

(ঘ) আশিকা ঃ আশিকা রচিত হয়েছিল ১৩১৬ খ্রিস্টাব্দে। এতে যুবরাজ খিজির খানের সঙ্গে গুজরাটের রাজা করণের কন্যা দেবল দেবীর প্রণয় ও বিয়ের বিবরণ আছে। তাছাড়া এতে কবির মোঙ্গলদের হাতে বন্দী হওয়া এবং আলাউদ্দিন খলজীর গুজরাট, চিতোর ও মালওয়া বিজয়ের ঘটনাবলির বর্ণনা রয়েছে।

(ঙ) নুহ সিপার ঃ এটি রচিত হয়েছিল ১৩১৮ খ্রিস্টাব্দে। মোবারক শাহ খলজীর সামরিক অভিযানগুলো ছাড়াও এ গ্রন্থে দিল্লির চমৎকারিত্ব, দেশের মনোরম আবহাওয়া, ঋতু, ফল, দর্শন, আচার-আচরণ, ভাষা ইত্যাদির বিবরণ রয়েছে।

(চ) তুঘকলনামা ঃ জীবনের শেষ প্রান্তে ১৩২৫ খ্রিস্টাব্দে আমীর খসরু রচনা করেন তুঘলকনামা। এ গ্রন্থে তিনি গাজি মালিকের সঙ্গে নাসিরউদ্দিন খসরুর যুদ্ধের এবং গাজি মালিকের সিংহাসনারোহণের বর্ণনা দিয়েছেন।

জিয়াউদ্দিন বারাণী ঃ সুলতানি আমলের শ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক ছিলেন বারাণী। তাঁর তারিখ-ই-ফিরোজশাহী রচিত হয়েছিল ১৩৫৭ খ্রিস্টাব্দে। বারাণী তাঁর গ্রন্থে সুলতান গিয়াসউদ্দিন বলবনের সিংহাসন আরোহণের সময় থেকে শুরু করে সুলতান ফিরোজ শাহ তুঘলকের রাজত্বের প্রথম ছয় বছর পর্যন্ত সময়ের ইতিহাস লিপিবদ্ধ করেন। তাঁর পিতা মুঈন-উল-মুলক আলাউদ্দিন খলজীর রাজত্বকালে বারাণের গভর্নর নিযুক্ত হয়েছিলেন। তাঁর পিতৃব্য আলাউল মুলক এবং মাতামহ হিসামউদ্দিন দুজনই ছিলেন দিল্লির সুলতানদের অধীনে উচ্চ রাজপদে নিযুক্ত। বারাণী নিজেও ১৩৩৩ খ্রিস্টাব্দ থেকে মুহাম্মদ বিন তুঘলকের মৃত্যু পর্যন্ত ছিলেন সুলতানের বিশ্বস্ত ও ঘনিষ্ট অনুচর (নাদিম) এবং তিনি প্রায়ই দরবারে উপস্থিত থাকতেন। বহুসংখ্যক প্রভাবশালী আমীরের সঙ্গে তাঁর সুসম্পর্ক ছিল এবং দরবারে তাঁর অবাধ প্রবেশাধিকারও ছিল। কাজেই তাঁর তথ্যের উৎস ছিল বহু ধরনের এবং নির্ভরযোগ্য। মুহাম্মদ বিন তুঘলকের মৃত্যুর পর তাঁর দুর্দিন শুরু হয়

এবং তিনি পাঁচ মাস দিল্লির শহরতলীতে স্বেচ্ছানির্বাসনে বাস করেন। দিল্লিতে ফিরে এসে তিনি তাঁর হৃতমর্যাদা পুনরুদ্ধারের আশায় তারিখ-ই-ফিরোজশাহী এবং ফতোয়া-ই-জাহানদারী রচনার কাজে মনোনিবেশ করেন। বারাণী তাঁর ইতিহাসে শুধু সুলতান, দরবার ও অভিযান সম্পর্কেই বিবরণ দেননি, শাসকদের সংস্কারমূলক কার্যাবলী, বাজারের দ্রব্যমূল্য, রাজস্ব-বিধিমালা, সরকারি কর্মচারী, কবি, ঐতিহাসিক, চিকিৎসক ইত্যাদিও তাঁর রচনায় স্থান পেয়েছে। তাঁর গ্রন্থ সম্পর্কে তিনি বলেছেন যে গত এক হাজার বছরেও তারিখ-ই-ফিরোজশাহীর মত কোন গ্রন্থ রচিত হয়নি। নিজামউদ্দিন আহমদ বখশি, বাদাউনী, ফিরিশতা– বস্তুত ষোড়শ ও সপ্তদশ শতকের প্রায় সব ঐতিহাসিকই বারাণীর ওপর নির্ভর করেই সুলতানি আমলের ইতিহাস রচনা করেছেন। তারিখ-ই-ফিরোজশাহীতে বলবন, কায়কোবাদ, জালালউদ্দিন খলজী, আলাউদ্দিন খলজী, কুতুবউদ্দিন মোবারক শাহ খলজী, নাসিরউদ্দিন খসরু খান, গিয়াসউদ্দিন তুঘলক, মুহাম্মদ বিন তুঘলক এবং ফিরোজ শাহ তুঘলকের রাজত্বকালের বিবরণ রয়েছে। উল্লেখ্য যে বারাণী তাঁর বইটি শেষোক্ত সুলতানকে উৎসর্গ করেছিলেন।

ঐতিহাসিক হিসাবে বারাণীর কিছু ত্রুটিও লক্ষ করা যায়। তিনি ঘটনার সময়ানুক্রম অনুসরণ করেন নি। তাঁর ইতিহাসে তারিখও খুব বেশি উল্লেখ করা হয়নি। মুহাম্মদ বিন তুঘলকের ২৫ বছরের দীর্ঘ রাজত্বকালের মাত্র ৪টি তারিখ তিনি উল্লেখ করেছেন যেমন তাঁর সিংহাসনারোহণ, গুজরাট অভিযান, খলিফার সনদ লাভ এবং তাঁর মৃত্যু। তাছাড়া বারাণীকে নিরপেক্ষও বলা যায় না- দুর্দিনে সুলতানের কৃপা দৃষ্টি আকর্ষণ করে নিজের ভাগ্যোন্নয়ন ছিল তাঁর এ গ্রন্থ রচনার উদ্দেশ্য। কাজেই অতিরঞ্জন ও সত্য-গোপন দুটোরই দৃষ্টান্ত তাঁর গ্রন্থে রয়েছে। এসব সত্তেও সুলতানি আমলের ইতিহাসের উৎস হিসাবে বারাণীর তারিখ-ই-ফিরোজশাহী যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সে কথা আধুনিক প্রায় সব ঐতিহাসিকই স্বীকার করেন।

তারিখ-ই-ফিরোজশাহী ছাড়া বারাণীর ফতোয়া-ই-জাহানদারী গ্রন্থটিও এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। এটি রচিত হয়েছিল ১৩৫৯ খ্রিস্টাব্দে। সুলতানের জন্য এতে রাষ্ট্রপরিচালনা বিষয়ক বেশ কিছু উপদেশ-নির্দেশ রয়েছে।

তাবাকাৎ-ই-নাসিরির পাণ্ডুলিপির মধ্যে মুহাম্মদ বিন তুঘলকের আত্মজীবনী বলে বিবেচিত ৪টি পৃষ্ঠা পাওয়া গেছে। অধ্যাপক মুহাম্মদ হাবিব ও আগা মাহদী হুসেন এটিকে মুহাম্মদ বিন তুঘলকের আত্মজীবনীর খন্ডিতাংশ বলেই মনে করেন।এতে গিয়াসউদ্দিন বলবন থেকে খসরু খান পর্যন্ত দিল্লির সিংহাসন জবরদখলকারীদের বিবরণ রয়েছে।এতে গিয়াসউদ্দিন বলবন, জালালউদ্দিন খলজী এবং আলাউদ্দিন খলজীর তীব্র সমালোচনা করা হলেও গিয়াসউদ্দিন তুঘলকের উচ্ছ্বসত প্রশংসা করা হয়েছে। আগা মাহদী হুসেন এ খন্ডিত আত্মজীবনীকে তাঁর চরিত্র ও মনস্তত্ত্ব বোঝার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচনা করেন। কিন্তু অনেক আধুনিক ঐতিহাসিকই এ পৃষ্ঠা কয়টির প্রামাণিকতা নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন।

শামস-ই-সিরাজ আফিফ : তাঁর গ্রন্থের নাম তারিখ-ই-ফিরোজশাহী; শুধুমাত্র ফিরোজ শাহ তুঘলকের রাজত্বকাল এ গ্রন্থের বিষয়বস্তু। তৈমুরের ভারত আক্রমণের কয়েক বছর পর দিল্লিতে এ গ্রন্থ রচিত হয়েছিল। এটি সহজ-প্রাঞ্জল ভাষায় রচিত।

সিরাত-ই-ফিরোজশাহী : এ গ্রন্থের লেখকের নাম জানা যায় না। ফিরোজ শাহ তুঘলকের রাজত্বকালে এবং সম্ভবত তাঁরই নির্দেশে রচিত এ গ্রন্থে তাঁর রাজত্বকালের প্রথম অংশের নির্ভরযোগ্য বিবরণ পাওয়া যায়।

ফুতুহাত-ই-ফিরোজশাহী : ফিরোজ শাহ তুঘলক নিজেই এটা রচনা করেছিলেন। এ গ্রন্থের গুরুত্ব হচ্ছে এই যে এটা থেকে আমরা সুলতানের মানসিকতা ও ধর্মীয় মনোভাব সম্পর্কে জানতে পারি।

ইসামী : তাঁর সম্পূর্ণ নাম হচ্ছে খাজা আব্দুল মালিক ইসামী। কাব্যাকারে রচিত তাঁর গ্রন্থের নাম ফুতুহুস সালাতীন। ইসামী ১৩১১ খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ১৩৫০ খ্রিস্টাব্দে তাঁর এই গ্রন্থ রচনা শেষ করেন। ১৩২৭ খ্রিস্টাব্দে মুহাম্মদ বিন তুঘলকের আদেশে তিনি তাঁর ৯০ বছর বয়সী পিতামহের সঙ্গে দৌলতাবাদে যেতে বাধ্য হন। তাঁর পিতামহ অবশ্য দৌলতাবাদ পৌঁছাতে পারেন নি, পথেই তাঁর মৃত্যু হয়। ফুতুহুস সালাতীনে গজনীতে সুলতান মাহমুদের উত্থানের সময় থেকে মুহাম্মদ বিন তুঘলকের রাজত্বকালের ঘটনাবলির বিবরণ পাওয়া যায়। ইসামী তথ্যের উৎস উল্লেখ না করলেও তাঁর বিবরণ থেকে এটা

নিশ্চিতভাবে প্রতীয়মান যে তিনি নির্ভরযোগ্য ঐতিহাসিক কিছু উৎসের সাহায্য গ্রহণ করেছিলেন। আলাউদ্দিন খলজীর রাজত্বকালের ইতিহাস বর্ণনায় তিনি সেই সুলতানের রাজত্বকালের সমসাময়িক কিছু প্রত্যক্ষদর্শীর কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করেছিলেন বলে মনে হয়। একাধিক স্থানে তিনি বলেছেন যে বৃদ্ধ ও অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের কাছে পাওয়া তথ্যের ওপর নির্ভর করেই তিনি তাঁর গ্রন্থ রচনা করেছেন। দৌলতাবাদেই তিনি বসবাস করতে থাকেন এবং বাহমনী বংশের প্রতিষ্ঠাতা আলাউদ্দিন হাসান বাহমন শাহের পৃষ্ঠপোষকতায় তাঁর গ্রন্থ রচনা করেন। তুঘলক আমলের তিনিই একমাত্র ঐতিহাসিক, যিনি ছিলেন সে বংশের সুলতানদের অনুগ্রহ বা ভীতির উর্দ্ধে। তবে তিনি পক্ষপাতদুষ্ট ছিলেন না একথা বলা যায় না। রাজধানী স্থানান্তরের ফলে তিনি কষ্টভোগ করেছিলেন, তারফলে মুহাম্মদ বিন তুঘলকের প্রতি তিনি ছিলেন শত্রুভাবাপন্ন এবং সুলতানের তিনি তীব্র নিন্দা করেছেন। তিনি আলাউদ্দিন খলজীর সঙ্গে মুহাম্মদ বিন তুঘলককে তুলনা করেছেন। তিনি আলাউদ্দিন খলজীর উচ্চ প্রশংসা করেছেন, কিন্তু মুহাম্মদ বিন তুঘলকের অবমূল্যায়ন করেছেন। ইসামীর বিবরণ অনুযায়ী মুহাম্মদ বিন তুঘলক জনগণকে সুষ্ঠু ও সহানুভূতিশীল প্রশাসন উপহার দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন এবং তাদের মধ্যে প্রচুর অর্থ বিতরণ করে তাদের হৃদয় জয় করেছিলেন, কিন্তু সুলতান হওয়ার পর তাঁর চারিত্রিক পরিবর্তন ঘটে এবং তিনি সন্দিগ্ধ ও অত্যাচারী হয়ে ওঠেন। সমসাময়িক হওয়া সত্তেও ইসামী ও বারাণীর মধ্যে মনে হয় কখনও যোগাযোগ ঘটেনি। মনে হয় একজন অপর জন সম্পর্কে কিছুই জানতেন না। নিজামউদ্দিন আহমদ বখশি, বাদাউনী, ফিরিশতা- বস্তুত ষোড়শ ও সপ্তদশ শতকের প্রায় সব বিখ্যাত ঐতিহাসিকই সুলতানি আমলের ইতিহাস রচনায় বারাণীর তারিখ-ই-ফিরোজশাহী ও ইসামীর ফুতুহুস সালাতীনের ওপর নির্ভরশীল ছিলেন।

ইয়াহিয়া বিন আহমদ সিরহিন্দী : সৈয়দ আমলের একমাত্র সমসাময়িক ইতিহাস গ্রন্থ হচ্ছে ইয়াহিয়া বিন আহমদ সিরহিন্দী রচিত তারিখ-ই-মোবারকশাহী। সৈয়দ বংশের দ্বিতীয় সুলতান মোবারক শাহের (১৪২১-১৪৩৪ খ্রিঃ) রাজত্বকালে এ গ্রন্থ রচিত হয়েছিল। সৈয়দ বংশের প্রথম দুজন সুলতানের রাজত্বকালের কুড়ি বছরের (১৪১৪-১৪৩৪) বিবরণ এ গ্রন্থে পাওয়া যায়। মোবারক শাহের দরবারে তাঁর প্রবেশাধিকার ও সরকারি মহলে সুবিধাজনক অবস্থানের কারণে বিভিন্ন ঘটনাবলি জানার সুযোগ ছিল তাঁর। নিজামউদ্দিন আহমদ বখশি, বাদাউনী এবং ফিরিশতাসহ পরবর্তী প্রায় সকল ঐতিহাসিকই এ গ্রন্থকে প্রামান্য উৎস হিসাবে ব্যবহার করেছেন।

আফগান শাসনের প্রথম পর্যায়ে লোদি বংশের শাসনামলে তেমন বিখ্যাত কোন ইতিহাস গ্রন্থ রচিত হয়নি। লোদি আমলের ইতিহাস জানার জন্য আমাদের সপ্তদশ শতাব্দীতে রচিত তিনটি গ্রন্থের ওপর নির্ভর করতে হয়। এর সবগুলোই বাহুলুল লোদির রাজত্বকাল থেকে শুরু। আহমদ ইয়াদগার ১৬০১ খ্রিস্টাব্দে লিখেছিলেন তারিখ-ই-শাহী বা তারিখ-ই-সালাতীন-ই-আফগানা। হিমুর মৃত্যু পর্যন্ত সময়কালের বিবরণ এ গ্রন্থে পাওয়া যায়। ১৬১২ খ্রিস্টাব্দে লেখা নিয়ামত উল্লাহর মাখজান-ই-আফগানী ইব্রাহিম লোদির রাজত্বকালের বিবরণ দিয়ে শেষ করা হয়েছে।জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে আবদুল্লাহ লিখেছিলেন তারিখ-ই-দাউদী। ১৫৭৫ খ্রিস্টাব্দে দাউদের মৃত্যু পর্যন্ত সময়কালের বিবরণ এ গ্রন্থে আছে।

সমসাময়িককালে রচিত ইতিহাস গ্রন্থগুলো হচ্ছে আমাদের তথ্যের প্রধান উৎস এবং বহুদিক থেকেই অত্যন্ত মুল্যবান। কিন্তু এগুলোর কিছু ত্রুটিও দেখা যায়। এগুলো হচ্ছে দরবারী ইতিহাস। প্রচুর তথ্য, সামরিক অভিযানের মোটামুটি সঠিক তারিখ ও বিবরণ এবং অন্যান্য ঘটনার বিবরণ এগুলোতে রয়েছে। কিন্তু রচয়িতারা যে সব সময়ই নিরপেক্ষতার পরিচয় দিতে পেরেছেন একথা বলা যায় না। তাছাড়া এ সব ঐতিহাসিক শুধুমাত্র সুলতান ও তাঁর কার্যাবলীর দিকেই তাঁদের মনোযোগ দিয়েছেন। তাঁরা দরবার, রাজধানী, শাসক ও অভিজাত শ্রেণীর বাইরে তাঁদের দৃষ্টি প্রসারিত করেন নি। সাধারণ মানুষের জীবন-চর্যা, সামাজিক রীতি-নীতি, আর্থিক অবস্থা ইত্যাদি তাঁদের বিবরণে খুব কমই উল্লেখিত হয়েছে।

পরবর্তীকালে লিখিত চারটি ইতিহাস গ্রন্থ থেকেও সুলতানি আমলের ভারতবর্ষ সম্পর্কে জানা যায়। এগুলো হচ্ছে আবুল ফজলের আকবরনামা, নিজামউদ্দিন আহমদ বখশির তাবাকাত-ই-আকবরী, আবদুল কাদের বাদাউনীর মুন্তাখাব-উৎ-তাওয়ারিখ এবং আবুল কাসিম ফিরিশতার তারিখ-ই-ফিরিশতা। প্রথমোক্ত তিনটি

গ্রন্থ আকবরের আমলে এবং দিল্লিতে রচিত। শেষোক্ত গ্রন্থটি বিজাপুরের সুলতান ইব্রাহিম আদিল শাহের সময়ে ১৬১২ খ্রিস্টাব্দে রচিত হয়। ফিরিশতা দাক্ষিণাত্যে বসে তাঁর গ্রন্থ লিখলেও উপাদান সংগ্রহের জন্য তিনি প্রায় সমস্ত উত্তর ভারত ভ্রমণ করেছিলেন। দাক্ষিণাত্যে বসে লেখার ফলে ও উৎসের প্রাচুর্যের কারণে ফিরিশতা আলাউদ্দিন খলজীর দাক্ষিণাত্য অভিযান সম্পর্কে বারাণী বা ইসামীর চেয়েও অধিকতর বিস্তারিত বিবরণ দিতে পেরেছেন। ১৫৯৩ খ্রিস্টাব্দে রচিত তাবকাৎ-ই-আকবরীতে মূলত: বারাণীর ওপর নির্ভর করেই সুলতানি আমলের বিবরণ দেওয়া হয়েছে। ১৫৯৬ খ্রিস্টাব্দে লেখা মুন্তাখাব-উৎ-তাওয়ারিখ বারাণী ও ইয়াহিয়া- দুজনের ওপরই নির্ভর করে লেখা।

শুধুমাত্র মুসলিম উৎসের ওপর নির্ভর করে ইতিহাস রচনা করলে সেটা সুষম ও গ্রহণীয় নাও হতে পারে। অধ্যাপক হাবিবুল্লাহ যেমন বলেছেন যে, বিজিত জনগণের মন-মানস তাদের লেখার মাধ্যমেই প্রকাশ পেতে পারে। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে সুলতানি আমলে রচিত ঐতিহাসিক প্রকৃতির খুব বেশি গ্রন্থ আমরা পাইনা। চাঁদবদই রচিত পৃথ্বিরাজচরিত প্রাথমিক হিন্দী কবিতার উত্তম দৃষ্টান্ত হলেও ইতিহাসের উৎস হিসাবে কোন কাজে আসে না।অজ্ঞাতনামা লেখকের রচিত ও অসম্পূর্ণ পৃথ্বিরাজ-বিজয় লেখা হয়েছিল পৃথ্বিরাজের রাজত্বকালে। এটাতে কিছু কিছু ইতিহাসের উপাদান পাওয়া যায়। পৃথ্বিরাজের বংশধর এবং রণথম্ভোরের চৌহান রাজা হামিরের কৃতিত্ব বর্ণনাকারী হামির-মহাকাব্য ইতিহাস রচনায় যথেষ্ট সাহায্য করে। এটার রচয়িতা ছিলেন নয়চন্দ্র।

সুফিদের জীবন-চরিত, তাঁদের লেখা চিঠিপত্র এবং শিষ্যদের সঙ্গে তাঁদের আলোচনার বিবরণও সুলতানি আমলের ইতিহাস রচনায় আমাদের সাহায্য করে। সুফিদের জীবন-চরিতগুলোর মধ্যে নিম্নলিখিতগুলো বিশেষ উল্লেখযোগ্যঃ

মীর খুর্দ লিখেছিলেন সিয়ার-উল-আউলিয়া। চিশতী তারিকার ভারতীয় সুফিদের বিবরণ রয়েছে এতে। এতে প্রধানত শেখ নিজামউদ্দিন আউলিয়ার জীবন বিবরণ দেওয়া হয়েছে এবং এ গ্রন্থে মুহাম্মদ বিন তুঘলকেরও উল্লেখ আছে। শেখ আবদুল হক দেহলভীর আখবার-উল-আখিয়ার এবং আবদুর রহমান চিশতীর মিরাত-উল-আসরার গ্রন্থ দুটিতে বেশ কয়েকজন সুফির জীবনী আলোচনা করা হয়েছে।

সুফিরা প্রায়ই তাঁদের শিষ্যদের সঙ্গে আলোচনায় বসতেন। এসব আলোচনা সভায় আধ্যাত্মিক তত্ত্ব আলোচিত হতো এবং সুফিরা মাঝে মাঝে শিষ্যদের উপদেশ দিতেন। সুফিদের আলোচনা মলফুজ হিসাবে পরিচিত। এসব আলোচনা সভায় সুফিরা মাঝে মাঝে দৃষ্টান্ত দেখাতে গিয়ে পূর্ববর্তী সুফি এবং সুলতানদের কথা উল্লেখ করতেন। সুফিদের শিষ্যরা সমাজের বিভিন্ন শ্রেণী থেকে আসায় সমসাময়িককালের খাদ্য, পানীয়, আচার-অনুষ্ঠান, সমাজ ও সংস্কৃতি সম্পর্কে এ সব আলোচনা থেকে মূল্যবান তথ্য আহরণ করা যায়। বিখ্যাত সুফিদের মলফুজ বা আলোচনার মর্ম তাঁদের শিষ্যরা বই-এর আকারে লিপিবদ্ধ করেছেন। কবি আমীর হাসান সজ্জি শেখ নিজামউদ্দিন আউলিয়ার দৈনিক আলোচনা 'ফওয়ায়েদ-উল-ফওয়াদ' নামক গ্রন্থে প্রকাশ করেছেন। সুফির চারপাশের মানুষ ও ঘটনাবলি সম্পর্কে এতে কৌতূহলোদ্দীপক সব মন্তব্য রয়েছে। এটি এ জাতীয় অন্যান্য গ্রন্থের আদর্শরূপে ব্যবহৃত হয়েছে। এ জাতীয় অন্যান্য মূল্যবান গ্রন্থগুলো হচ্ছে শেখ কলন্দর রচিত নাসিরউদ্দিন চেরাগ-ই দিল্লির আলোচনাসমূহ সম্বলিত 'খায়ের-উল-মজলিস', আমীর খসরু রচিত নিজামউদ্দিন আউলিয়ার আলোচনাসমূহ সম্বলিত 'আফজল-উল-ফওয়ায়েদ' এবং 'রাহাত-উল-মুহিব্বীন', এবং শেখ কুতুবউদ্দিন বখতিয়ার খলজীর আলোচনাসমূহ সম্বলিত 'ফওয়ায়েদ-উল-সালেকীন'।

বিভিন্ন সময়ে এবং বিভিন্ন উপলক্ষ্যে সুফিদের লিখিত চিঠিপত্রেও ঐতিহাসিক তথ্য পাওয়া যায়। এসব চিঠিতে সমকালীন রাজনৈতিক, সামাজিক ও ধর্মীয় অবস্থার বিবরণ পাওয়া যায়। এসব চিঠিতে প্রধানত সুফিতত্ত্ব আলোচিত হলেও মাঝে মাঝে রাজনৈতিক বিষয়াবলী-সুলতানদের কর্তব্য ইত্যাদিরও আলোচনা থাকে।

(খ) বিদেশীদের বিবরণ

ভারত ভ্রমণকারী বিদেশী পর্যটক অথবা ভারতে না এসেও ভারত-প্রত্যাগত বণিক বা অন্যান্য মানুষের মুখ থেকে শুনে বিদেশীরা ভারতবর্ষ সম্পর্কে বিবরণ রচনা করেছেন।

বিদেশী পর্যটকদের মধ্যে মরক্কোর অধিবাসী ইবনে বতুতা সবচেয়ে বেশি বিখ্যাত। ১৩০৪ খ্রিস্টাব্দে তাঞ্জিয়ারে তিনি জন্ম গ্রহণ করেন এবং ৭৪ বছর বয়সে ১৩৭৮ খ্রিস্টাব্দে ফেজ এ মৃত্যুবরণ করেন। ১৩৩৩ খ্রিস্টাব্দে মুহাম্মদ বিন তুঘলকের রাজত্বকালে তিনি ভারতবর্ষে আসেন এবং দীর্ঘ ১৪ বছর এদেশে ছিলেন। মুহাম্মদ বিন তুঘলক তাঁকে দিল্লির কাজি পদে নিয়োগ করেন এবং এ পদে তিনি ৮ বছর অধিষ্ঠিত ছিলেন। এরপর তিনি সুলতানের দূত হিসাবে চীনে প্রেরিত হন। পথে জাহাজ ডুবির ফলে মালদ্বীপে এক বছর কাটিয়ে ভারতে ফিরে আসেন।১৩৪৬ খ্রিস্টাব্দে তিনি বাংলায়ও এসেছিলেন এবং সিলেটে হজরত শাহজালালের সঙ্গে দেখা করেছিলেন।বাংলা থেকে সমুদ্র পথে জাভা, চীন ও মক্কাশরীফ ঘুরে ১৩৪৯ খ্রিস্টাব্দে নিজদেশ মরক্কোতে ফিরে যান। বিভিন্ন দেশে ভ্রমণকালে তিনি তাঁর অভিজ্ঞতা তাঁর ডায়েরীতে লিখে রাখতেন। দুর্ভাগ্যক্রমে কোন এক সময় পথে সেটা হারিয়ে যায়। দেশে ফিরে এসে তিনি তাঁর অভিজ্ঞতা ইবনে জুজাই নামে সাধারণ্যে পরিচিত আবু আবদুল্লাহ্ মুহাম্মদ ইবনে মুহাম্মদের কাছে বর্ণনা করেন। ইবনে জুজাই তাঁর এ অভিজ্ঞতার বিবরণ রেহালা নামে সম্পাদনা করে প্রকাশ করেন।

আলাউদ্দিন খলজীর সমকালীন প্রত্যক্ষদর্শীদের কাছ থেকে পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে ইবনে বতুতা সে সুলতানের রাজত্বকাল সম্পর্কে লিখেছেন। কারণ আলাউদ্দিন খলজীর মৃত্যুর ১৭ বছর পর তিনি এদেশে এসেছিলেন। মুহাম্মদ বিন তুঘলকের দরবারে দীর্ঘদিন অবস্থানের ফলে সেই সুলতান এবং সেই সময় সম্পর্কে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে তিনি বিবরণ লিখেছেন। তাঁর রেহালায় সমকালীন রাজনীতি, বিচার ও সামরিক ব্যবস্থা, সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য পাওয়া যায়। ডাক বিভাগ, রাস্তাঘাট, কৃষিজপণ্য, বাণিজ্য, নৌ চলাচল, সঙ্গীত প্রভৃতি সম্পর্কেও রেহালা আলোকপাত করে।

ইবনে বতুতার রেহালার ত্রুটিও আছে। বৃদ্ধ বয়সে তাঁর স্মৃতিশক্তি দুর্বল হয়ে পড়ে, পথে তিনি তাঁর ডায়রীও হারিয়ে ফেলেছিলেন। ফলে ঘটনা, স্থান বা ব্যক্তির নাম, তারিখ সম্পর্কে বেশ কিছু ভুল তথ্য তাঁর বিবরণে ঢুকে পড়েছে। সিলেটে তিনি দেখা করেছিলেন শাহ জালাল কুনিয়ার সঙ্গে, কিন্তু বলেছেন শাহজালাল তাব্রিজী। তাছাড়া বিদেশী হওয়ায় এদেশের রীতিনীতিও তিনি ঠিকমত বুঝতে পারেন নি। তিনি ফার্সি ভালো জানতেন না, হিন্দী কিছুই বুঝতেন না। সমায়নুক্রম সম্পর্কেও তিনি ছিলেন উদাসীন। এতকিছু সত্ত্বেও বলা যায় যে, সুলতানি আমলের উৎস হিসাবে ইবনে বতুতার রেহালা অত্যন্ত মূল্যবান।

শিহাবউদ্দিন আহমদ আব্বাস (১৩০০-১৩৫০ খ্রি:) নামক দামেশ্কের একজন অধিবাসী ভারতে না এসেও পর্যটকদের মুখে শুনে এদেশ সম্পর্কে একটি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। বদরউদ্দিন নামে তাশখন্দের একজন অধিবাসী কিছুদিন মুহাম্মদ বিন তুঘলকের দরবারে অবস্থান করেছিলেন। ফার্সিতে রচিত তাঁর কবিতাগুলো অনেক ঘটনার তারিখ নির্ধারণে আমাদের সাহায্য করে। পারস্যের দূত হয়ে আব্দুর রাজ্জাক ১৪৪২ খ্রিস্টাব্দে কালিকটের রাজদরবারে এসেছিলেন।তিনি বিজয়নগর রাজ্যের সমাজ ও শাসনব্যবস্থা সম্পর্কে একটি বিস্তারিত বিবরণ লিখেছিলেন। ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষভাগে মার্কো পোলো দক্ষিণ ভারতে আসেন। সেখানকার অশ্ব-ব্যবসা সম্পর্কে তিনি বিবরণ দিয়েছেন। তদানীন্তন প্রায় সকল ভারতীয় বন্দরেই তিনি গিয়েছেন এবং বহির্বাণিজ্যের বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছেন।ইতালির অধিবাসী নিকোলো কন্তি ১৪২০ খ্রিস্টাব্দে বিজয়নগরে এসেছিলেন। আলফন্সে ডি বুকার্ক নামে একজন পর্তুগীজ ভারত থেকে তাঁর রাজাকে কিছু চিঠি লিখেছিলেন। এ চিঠিগুলোর ভিত্তিতে তাঁর ছেলে একটি বিবরণ সংকলন করেন যা থেকে পর্তুগালের সঙ্গে গুজরাটের সম্পর্কের বিবরণ জানা যায়। ইউরোপীয় অন্যান্য লেখকদের মধ্যে রুশ ব্যবসায়ী নিকিতিন ১৪৭০ খ্রিস্টাব্দের দিকে বাহমনী রাজ্যে এসেছিলেন। এ ছাড়া ভাস্কো ডা গামা, ভারথেমা, বার্বোসা, জোয়া দ্য ব্যারোস, সিজার ফ্রেডারিক মূল্যবান তথ্য লিপিবদ্ধ করে গেছেন।ইউরোপীয় পরিব্রাজকরা বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে এ দেশে আসলেও এবং তাঁদের বিবরণে ব্যবসা-বাণিজ্য সম্পর্কেই বেশি

আলোচনা থাকলেও তাঁরা মাঝে মাঝে দেশের সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক অবস্থা সম্পর্কেও আলোকপাত করতেন। তুর্কিদের বিহার জয়ের কয়েক বছর পর ধর্মাস্বামী নামে একজন তিব্বতীয় ভিক্ষু বিহারের মঠ ও মন্দিরগুলো দেখতে এসেছিলেন।তিনি নালন্দা মঠে দুবছর অবস্থান করেছিলেন এবং নালন্দা মঠ ও অন্যান্য তীর্থস্থানগুলোর অবস্থা বর্ণনা করেছেন।

(গ) সমসাময়িক শিলালিপি ও মুদ্রা

সুলতানি আমলের বহু শিলালিপি ও মুদ্রা আবিষ্কৃত হয়েছে। প্রাচীন ভারতের ইতিহাস পুনর্গঠনের উৎস হিসাবে এগুলো যত গুরুত্বপূর্ণ, সুলতানি আমলের ইতিহাসের উৎস হিসাবে ততটা না হলেও এগুলো যথেষ্ট মূল্যবান। উৎস হিসাবে এগুলোর সাক্ষ্য একারণেই মূল্যবান যে এগুলো কেবলমাত্র সমসাময়িকই নয়, এগুলো উৎকীর্ণ হত সুলতান বা তাঁর উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের তদারকের মাধ্যমে।উৎকীর্ণ অধিকাংশ শিলালিপি ও মুদ্রার ভাষা আরবী, তবে ফার্সি ভাষায় উৎকীর্ণ শিলালিপি ও মুদ্রাও দেখা যায়। শিলালিপিগুলোতে সাধারণত কোরানের আয়াত, রসুলের (দঃ) উক্তি, সুলতানের নাম, উপাধি, উৎকীর্ণকারী কর্মকর্তার নাম ও পরিচয় এবং তারিখ থাকত। শিলালিপিতে সুলতানের রাজ্য বিজয়, মসজিদ, মাদ্রাসা, এতিমখানা প্রভৃতির মত জনহিতকর প্রতিষ্ঠান স্থাপনের কথাও উল্লেখ আছে যা থেকে সুলতানের রাজনৈতিক ও জনহিতকর কার্যাবলীর পরিচয় পাওয়া যায়।

মুদ্রায় সাধারণত কলেমা, খলিফাদের নাম, সুলতানের নাম ও পরিচয়, তারিখ, এবং টাকশালের নাম উৎকীর্ণ থাকত।কোনো কোনো শিলালিপিতে প্রশাসনিক বিভাগের নামের উল্লেখ আছে। মুদ্রায় মাঝে মাঝে খলিফার নামের উল্লেখ থেকে খিলাফতের গুরুত্ব এবং সুলতানের সঙ্গে খলিফার সম্পর্ক জানা যায়। শিলালিপি ও মুদ্রা থেকে সুলতানদের কালক্রম নির্ধারণ করা যায়। মুদ্রায় উৎকীর্ণ টাকশালের নাম এবং শিলালিপির প্রাপ্তিস্থানের সাহায্যে সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি সম্পর্কে ধারণা লাভ করা যায়।

সারসংক্ষেপ

সুলতানি আমলের ভারতবর্ষের ইতিহাস পুনর্গঠনের উৎসগুলোকে তিন শ্রেণীতে ভাগ করা যায়– (ক) সাহিত্যিক উপাদান (ইতিহাস ও অন্যান্য গ্রন্থ, সুফিদের জীবন চরিত, তাঁদের লেখা চিঠি-পত্র ও আলোচনার বিবরণ);(খ) বিদেশীদের বিবরণ; (গ) সমসাময়িক শিলালিপি ও মুদ্রা। এগুলোর সাহায্যে সুলতানি আমলের ধারাবাহিক ইতিহাস রচনা করা তেমন কষ্টসাধ্য নয়। সুলতানি আমলে ও পরবর্তীকালে রচিত বিভিন্ন ইতিহাস গ্রন্থ থেকে সুলতানি আমলের ভারতবর্ষের ইতিহাস জানা যায়। এসব ইতিহাস গ্রন্থগুলোর মধ্যে আমির খসরুর কিরান-উস-সাদাইন, আশিকা; জিয়াউদ্দিন বারাণীর

তারিখ-ই-ফিরোজশাহী, ফতোয়া-ই-জাহানদারী, ইসামীর ফুতুহুস সালাতীন, ইয়াহিয়া বিন আহমদ সিরহিন্দীর তারিখ-ই-মোবারকশাহী উল্লেখযোগ্য।ইতিহাস গ্রন্থগুলোর মধ্যে অনেকগুলোই সুলতানদের পৃষ্ঠপোষকতায় রচিত হয়েছিল। ফলে রচয়িতারা সবসময় নিরপেক্ষতার পরিচয় দিতে পেরেছেন একথা বলা যায় না। তাছাড়া এসব ঐতিহাসিক শুধুমাত্র সুলতান ও অভিজাত শ্রেণীর দিকে তাদের মনোযোগ নিবদ্ধ রেখেছেন। ফলে সাধারণ মানুষের জীবন চর্চা, সামাজিক রীতিনীতি, আর্থিক অবস্থা ইত্যাদি সম্পর্কে তেমন তথ্য তাঁদের বিবরণে পাওয়া যায় না। বিদেশীদের বিবরণের মধ্যে মরক্কোর অধিবাসী ইবনে বতুতার রেহেলা সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। তিনি ১৩৩৩ খ্রিস্টাব্দে মুহাম্মদ বিন তুঘলকের রাজত্বকালে ভারতবর্ষে আসেন এবং দীর্ঘ ১৪ বছর এদেশে অবস্থান করেন। সুলতানি আমলের ইতিহাসের পুনর্গঠনের অন্যান্য উৎস হচ্ছে প্রাপ্ত সমসাময়িক বহু শিলালিপি ও মুদ্রা। এগুলো থেকে সুলতানদের নাম, পরিচয়, কালক্রম, জনহিতকর কার্যাবলী, সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি সম্পর্কে জানা যায়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন ঃ

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন–

১. হাসান নিজামির গ্রন্থের নাম-
   (ক) তাজুল মাসির (খ) ফতোয়া-ই-জাহানদারী
   (গ) তারিখ-ই-ফিরোজশাহী (ঘ) তাহকিক-ই-হিন্দ।

২. তারিখ-ই-মোবারকশাহীর লেখক ছিলেন-
   (ক) জিয়াউদ্দিন বারাণী (খ) শামস-ই-সিরাজ আফিফ
   (গ) মিনহাজ-উস-সিরাজ (ঘ) ইয়াহিয়া বিন আহমদ সিরহিন্দী।

৩. ইসামীর গ্রন্থের নাম-
   (ক) মুন্তাখাব-উৎ-তাওয়ারিখ (খ) আশিকা
   (গ) ফুতুহুস সালাতীন (ঘ) তুঘলকনামা।

৪. আমীর খসরু লিখেছিলেন-
   (ক) আইন-ই-আকবরী (খ) তাবাকাৎ-ই-নাসিরি
   (গ) আশিকা (ঘ) সিরাত-ই-ফিরোজশাহী।

৫. ইবনে বতুতা কোন দেশের অধিবাসী ?
   (ক) ইরান (খ) ইরাক
   (গ) মরক্কো (ঘ) মিশর।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ঃ

১। আমীর খসরু রচিত গ্রন্থগুলো থেকে আমরা কি কি তথ্য জানতে পারি?

২। জিয়াউদ্দিন বারাণী সম্পর্কে একটি টীকা লিখুন।

৩। সাহিত্যিক উপাদান হিসেবে ফুতুহুস সালাতীনের গুরুত্ব বর্ণনা করুন।

৪। 'মলফুজ' সম্পর্কে যা জানেন লিখুন।

৫। সুলতানি আমলের ইতিহাস পুনর্গঠনের উৎস হিসেবে শিলালিপি ও মুদ্রার গুরুত্ব নির্ণয় করুন।

রচনামূলক প্রশ্ন ঃ

১. সুলতানি আমলের ভারতবর্ষের ইতিহাস রচনার সাহিত্যিক উৎসগুলোর মূল্যায়ন করুন।

২. সুলতানি আমলের ভারতবর্ষের ইতিহাস রচনায় বিদেশীদের বিবরণ এবং প্রাপ্ত সমসাময়িক শিলালিপি ও মুদ্রা কতটুকু সহায়ক?

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

১। Elliot and Dowson, *History of India as told by its own Hostorians.*

২। P. Hardy, *Historians of Medieval India.*

৩। Ishwari Prasad, *Medieval India.*

৪। R.C. Majumdar (ed.), *History and Culture of the Indian People,* Vol-IV, *Delhi Sultanate.*

৬। এ.বি.এম. শামসুদ্দিন আহমেদ, *ইতিহাস সম্পর্কিত রচনাবলী।*

৭। প্রভাতাংশু মাইতী, *ভারত ইতিহাস পরিক্রমা।*

পাঠ - ৪

বাংলার ইতিহাসের উৎস ঃ প্রাচীন ও সুলতানি যুগ

উদ্দেশ্য

এই পাঠ পড়ে আপনি–

- প্রাচীন যুগে বাংলার ইতিহাসের উৎস সম্পর্কেজানতে পারবেন ;
- সুলতানি যুগে বাংলার ইতিহাসের উৎস সম্পর্কে অবহিত হবেন ;
- বাংলার ইতিহাসের উৎসের সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে ধারণা পাবেন ;
- উৎস বিশ্লেষণ করে কীভাবে ইতিহাস রচনা করতে হয় তা জানতে পারবেন।

আলোচনার সুবিধার্থে বাংলার ইতিহাসের উৎসসমূহ দুভাগে ভাগ করা যায়: প্রাচীন বাংলার ইতিহাসের উৎস এবং সুলতানি যুগের ইতিহাসের উৎস। উল্লেখ্য যে, মুসলিম-পূর্ব যুগের এবং মুসলিম যুগের উৎসের প্রকৃতি সম্পূর্ণ ভিন্ন। ভাষা ভিন্ন, উপাদান ভিন্ন এবং সেই কারণে পুনর্গঠিত ইতিহাসেরও রূপ ভিন্ন। প্রাচীন যুগে গ্রন্থাকারে রচিত লেখনির একান্ত অভাব। তাই ইতিহাস প্রত্নতাত্ত্বিক উৎসের ওপর অধিকতর নির্ভরশীল। কিন্তু সুলতানি যুগে গ্রন্থাকারে লিখিত উপকরণের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে।তবে সে উপকরণ দিল্লিকেন্দ্রিক হওয়ার কারণে ঐতিহাসিকদের প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদান থেকেও তথ্য সংগ্রহ করতে হয়। আমরা প্রাচীন যুগ ও সুলতানি যুগের উৎস সমূহ আলাদাভাবে আলোচনা করবো।

(ক) প্রাচীন যুগের ইতিহাসের উৎস

প্রাচীন ভারতের ন্যায় প্রাচীন বাংলার ইতিহাস পুনর্গঠনও সহজবোধ্য ব্যাপার নয়।কারণ উৎসের অপ্রতুলতা। প্রাচীন যুগে লিখিত গ্রন্থাদি নেই বললেই চলে। যাও আছে তার মধ্যে ইতিহাসের বিষয়বস্তু খুব বেশি নাই, আছে ধর্ম-কর্ম আর দেবদেবীর কথা। মানুষের কর্মকান্ড তার মধ্যে তেমন প্রাধান্য পায়নি। এই কারণে প্রাচীন বাংলার ইতিহাস পুনর্গঠনে ঐতিহাসিকদের নির্ভরশীল হতে হয়েছে প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদানের ওপর। প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদানের ওপর নির্ভর করেই দাঁড় করানো সম্ভব হয়েছে প্রাচীন যুগে বাংলার ইতিহাসের অবকাঠামো।তাই একথা বললে খুব একটা ভুল হবে না যে যদি আমরা কেবল গ্রন্থাগারে লিখিত উপাদানের ওপর নির্ভরশীল হতাম তাহলে আমরা প্রাচীন বাংলার ইতিহাস খুব কমই জানতে পারতাম।

প্রাচীন বাংলার ইতিহাস পুনর্গঠনের উৎসসমূহ দুটি ভাগে ভাগ করে আলোচনা করা যেতে পারে–

(১) গ্রন্থাকারে লিখিত উপাদান; (২) প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদান। আবার প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদানের মধ্যে রয়েছে– (ক) অভিলেখমালা (খ) মুদ্রা এবং (গ) প্রত্নতাত্ত্বিক ধ্বংসাবশেষ।

আমরা এখন বিভিন্ন প্রকারের উৎস সম্বন্ধে একে একে আলোচনা করবো।

গ্রন্থাকারে লিখিত উপাদান

প্রাচীন যুগের প্রাথমিক পর্যায়ে বাংলার ভূখন্ডে লিখিত গ্রন্থ তেমন একটা নেই বললেই চলে। বাংলার বাইরে লিখিত কিছু গ্রন্থে বাংলা সম্পর্কে যৎসামান্য কিছু তথ্য পাওয়া যায়। বৈদিক বা পরবর্তী বৈদিক সাহিত্যে বাংলার প্রাচীন জনপদ সমূহের নাম উল্লেখ পাওয়া যায় বটে, কিন্তু তেমন কোন বিস্তারিত তথ্য নেই। সম্ভবত: খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীতে রচিত কৌটিল্যের 'অর্থশাস্ত্র' গ্রন্থে বাংলা সম্বন্ধে বিধৃত তথ্যই এতদাঞ্চল সম্পর্কে প্রাচীনতম তথ্য।এই গ্রন্থে বাংলার সূক্ষ্ম সুতিবস্ত্রের উল্লেখ এ কথাই প্রমাণ করে যে, বাংলায় বয়নশিল্পের ঐতিহ্য সুপ্রাচীন। এছাড়া অর্থশাস্ত্রে তেমন কোন তথ্য নেই।

ভারতবর্ষের ইতিহাসে গুপ্ত যুগ স্বর্ণ যুগ বলে বিবেচিত।এ যুগের অন্যতম কৃতিত্ব সংস্কৃত সাহিত্যের বিকাশ। সাহিত্যের বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিকাশ ঘটলেও ইতিহাস সম্পর্কিত লেখনির তেমন কোন অগ্রগতি লক্ষ করা যায় না। মহাকবি কালিদাস রচিত রঘুবংশ কাব্যে রঘুর চরিত্র হয়েছিল গুপ্ত সম্রাট সমুদ্রগুপ্তের জীবনী অবলম্বনে। নৌযুদ্ধে পারদর্শী বঙ্গীয়দের বিরুদ্ধে রুঘুর বা সমুদ্রগুপ্তের যুদ্ধের কিছু বর্ণনা রয়েছে এই কাব্যে। বাংলা গুপ্ত সাম্রাজ্যভুক্ত হয়েছিল, যার প্রমাণ অন্যান্য সূত্র থেকেও পাওয়া যায়।

সপ্তম শতাব্দীর প্রথম ভাগে ভারতীয় সম্রাট হর্ষবর্ধনের সভাকবি বাণভট্ট রচিত 'হর্ষচরিত' গ্রন্থে হর্ষবর্ধনের সাথে বাংলার সম্রাট শশাঙ্কের সংঘর্ষের কিছু বিবরণ পাওয়া যায়। তবে বাণভট্টের বিবরণে একপেশে ভাব লক্ষণীয়। তাঁর বিবরণে হর্ষবর্ধনকে অতি উজ্জ্বল করে চিত্রিত করা হয়েছে; আর শশাঙ্ককে শত্রু হিসেবে হীন চরিত্রের অধিকারী বলে উল্লেখ করা হয়েছে। অন্য উৎসের অভাবে শশাঙ্কের ইতিহাস শত্রুপক্ষের লেখনির ওপরই নির্ভরশীল।

নবম-দশম শতাব্দীতে রচিত (রচয়িতার নাম জানা যায় না) 'আর্যমঞ্জুশ্রীমূলকল্প' গ্রন্থে বাংলার ইতিহাসের কিছু তথ্য পাওয়া যায়। তবে এই গ্রন্থে সমগ্র উত্তর ভারতের ইতিহাস লিপিবদ্ধ রয়েছে, তাও আবার এক বিশেষ ঢং-এ। গ্রন্থকার সব নামের আদ্যাক্ষর ব্যবহার করেছেন, কখনও পুরো নাম ব্যবহার করেননি। ফলে হয়তো জানা বিষয়ে কিছু সাহায্য পাওয়া যেতে পারে এই গ্রন্থ থেকে, কিন্তু অন্য সূত্র থেকে না পাওয়া তথ্য বোঝাই কঠিন। তবে এই সব অসুবিধা থাকা সত্তেও সপ্তম থেকে নবম শতাব্দী সময়ের বাংলার ইতিহাসের বেশ কিছু তথ্য এই গ্রন্থ সরবরাহ করে।

দ্বাদশ শতাব্দীর কবি সন্ধ্যাকর নন্দী রচিত 'রামচরিতম্' কাব্যে বাংলার পাল যুগের বিশেষ কিছু ঘটনা বিধৃত রয়েছে। শেষ পাল সম্রাট মদনপালের রাজত্বকালে রচিত এই গ্রন্থে দ্বিতীয় মহীপালের সময়ে সংঘটিত বরেন্দ্র বিদ্রোহ সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য পাওয়া যায়। তবে কাব্যটি প্রায় দুর্বোধ্য। দ্ব্যর্থবোধক কাব্যটির প্রতিটি শ্লোকের দুরকম অর্থ হয়; এক অর্থে বহুল পরিচিত রামায়ণের কাহিনী, যা বুঝতে তেমন অসুবিধা হয় না। দ্বিতীয় অর্থে রয়েছে সমসাময়িক ঘটনা। এই অর্থ বুঝতে কষ্টই হতো। তবে কাব্যটির একটি পান্ডুলিপিতে প্রথম দুই ভাগের গদ্য-ব্যাখ্যা আছে। তাই সমসাময়িক ঘটনা সম্পর্কে ধারণা করা সম্ভব। দ্বিতীয় মহীপালের রাজত্বকালে বরেন্দ্রে (উত্তরবঙ্গ) পাল শাসনের অবসান ঘটে, কৈবর্ত-প্রধান দিব্যের বা দিব্যোকের শাসন সেখানে প্রতিষ্ঠিত হয়। পরে পাল সম্রাট রামপাল দিব্যের ভ্রাতুস্পুত্র ভীমকে পরাজিত করে বরেন্দ্র পুনরুদ্ধার করে পাল সাম্রাজ্যের হৃত গৌরব ফিরিয়ে আনেন। এসব ঘটনার জন্য রামচরিত কাব্যই একমাত্র উৎস। তাছাড়া সন্ধ্যাকর নন্দীর কাব্যে বরেন্দ্রের সুন্দর বর্ণনা রয়েছে।

সেনযুগে বাংলায় সংস্কৃত সাহিত্যেও ব্যাপক বিকাশ ঘটেছিল। তবে অধিকাংশ রচনারই বিষয়বস্তু ছিল ধর্ম-কর্ম, পূজা-পার্বণ আর দান-দক্ষিণা।পার্থিব বিষয় খুব একটা স্থান পায়নি। তবে সেনযুগের কিছু কাব্যসংকলনে সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার, গ্রামীণ জীবনের কিছু ছবি বা অর্থনৈতিক অবস্থার যৎসামান্য বিবরণ পাওয়া যায়। অল্প হলেও এসব তথ্য সামাজিক ইতিহাসের অমূল্য উৎস। কাব্য সংকলনের মধ্যে শ্রীধর দাসের 'সদুক্তিকর্ণামৃত', বিদ্যাকরের 'সুভাষিতরত্নকোষ' এবং গোবর্ধনের 'আর্যসপ্তশতী' বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

তিব্বতী ঐতিহাসিক লামা তারনাথের 'ভারতে বৌদ্ধ ধর্মের ইতিহাস' (তিব্বতী ভাষায় রচিত) গ্রন্থে প্রাচীন বাংলার ইতিহাসের কিছু উপকরণ পাওয়া যায়; বিশেষ করে নবম-দশম শতাব্দীর বঙ্গ-সমতট সম্পর্কে বা পাল বংশের উত্থান সম্পর্কে। তবে একথা মনে রাখতে হবে যে, তারনাথ তাঁর গ্রন্থ রচনা করেছিলেন ১৬০৮ খ্রিস্টাব্দে। তাঁর গ্রন্থের মুখ্য বিষয় ছিল বৌদ্ধ ধর্ম। সুতরাং এতে অন্যান্য পার্থিব বিষয়াদি তেমন গুরুত্ব পায়নি। তাছাড়া তারনাথ তাঁর সময়ের অনেক পূর্বের বিষয়ে যেসব তথ্য দিয়েছেন তা যথাযথভাবে যাচাই না করে গ্রহণ করা যায় না।

বিদেশীদের বর্ণনা সব সময়ই ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ উৎস। খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দী থেকে প্রথম খ্রিস্টাব্দের মধ্যে রচিত কিছু গ্রিক ও লাতিন লেখনিতে বাংলা সম্বন্ধে সামান্য তথ্য পাওয়া যায়। এদের মধ্যে অজানা লেখকের 'পেরিপ্লাস অব দি ইরিথ্রিয়ান সী' গ্রন্থটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। গ্রিক ও লাতিন লেখনিতে বাংলার ভূভাগে 'গঙ্গারিডাই' নামক শক্তিশালী রাষ্ট্রের এবং 'গাঙ্গে' বন্দরের উল্লেখ পাওয়া যায়। এই অঞ্চলের সূক্ষ্ম সুতিবস্ত্রের খ্যাতি সেই সময়েই গ্রিক-রোমান জগৎ পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছেছিল।

পঞ্চম থেকে সপ্তম শতাব্দীর মধ্যে বেশ কয়েকজন চৈনিক বৌদ্ধ পন্ডিত বাংলায় এসেছিলেন; তাঁদের ভ্রমন বৃত্তান্তে বাংলা সম্বন্ধে তথ্য পাওয়া যায়। তবে এরা সবাই ভারতে এসেছিলেন বৌদ্ধ ধর্ম এবং রীতিনীতি সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান লাভের উদ্দেশ্যে। দেশে ফিরে এরা সবাই স্বদেশবাসীকে জানাবার উদ্দেশ্যে তাঁদের অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ করে গেছেন। তাঁদের বিবরণ স্বাভাবিক কারণেই বৌদ্ধ ধর্মকেন্দ্রিক। প্রসঙ্গক্রমে অন্যান্য বিষয় তাঁদের লেখনিতে স্থান পেয়েছে। চৈনিকদের মধ্যে প্রথম এসেছিলেন ফা-হিয়েন্, গুপ্ত সম্রাট দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বকালে। বাংলা সম্পর্কে তেমন কোন তথ্য তাঁর বৃত্তান্তে নেই। তাম্রলিপ্তি বন্দরের এবং ঐ বন্দরের মাধ্যমে বাণিজ্যের কিছু তথ্য তাঁর লেখা বিবরণ থেকে পাওয়া যায়।

সপ্তম শতাব্দীর প্রথম দিকে এসেছিলেন হিউয়েন সাং, উত্তর ভারতীয় পুষ্যভূতি বংশের সম্রাট হর্ষবর্ধনের রাজত্বকালে।তিনি সম্রাট হর্ষবর্ধনের পৃষ্ঠপোষকতা পেয়ে দীর্ঘকাল ভারতে কাটিয়েছেন।হর্ষবর্ধনের সমসাময়িক বাংলার সম্রাট ছিলেন শশাঙ্ক। শশাঙ্ক-হর্ষবর্ধনের সংঘর্ষের কথা হিউয়েন সাং-এর বিবরণে পাওয়া যায়। তবে স্বাভাবিক কারণেই তিনি হর্ষবর্ধনের পক্ষ অবলম্বন করেই বক্তব্য রেখেছেন। শশাঙ্ককে তিনি চিত্রিত করেছেন হীনচরিত্রের বৌদ্ধবিদ্বেষী রাজা হিসেবে। তাই শশাঙ্ক সম্পর্কে তাঁর দেওয়া সব তথ্যই বিশ্বাসযোগ্য নয়। শশাঙ্কের মৃত্যুর পর হিউয়েন সাং বাংলায় এসেছিলেন; কর্ণসুবর্ণ হয়ে পুন্ড্রনগর, সেখান থেকে কামরূপ হয়ে সমতট, তারপর তাম্রলিপি থেকে উড়িষ্যার ভেতর দিয়ে গিয়েছিলেন দক্ষিণ ভারতের দিকে। প্রায় সমগ্র বাংলাই তিনি পরিভ্রমণ করেছিলেন। বাংলার এসব অঞ্চল সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য রয়েছে তাঁর বিবরণে। তিনি পুন্ড্রনগর ও আশেপাশের এলাকায়, সমতটে বৌদ্ধ সংস্কৃতির নিদর্শনাদির উল্লেখ করেছেন। তাঁর দেওয়া তথ্যসমূহ সপ্তম শতাব্দীর প্রথমার্ধের বাংলা সম্পর্কে ইতিহাসের খুবই গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। তৃতীয় চৈনিক পরিব্রাজক ইৎ-সিং, সপ্তম শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে, বাংলায় এসেছিলেন। সমতট এলাকায় বৌদ্ধ ধর্মের প্রসার ও বৌদ্ধরাজ বংশ খড়্গদের সম্পর্কে কিছু তথ্য পাওয়া যায় তাঁর বিবরণে।

নবম থেকে একাদশ শতাব্দীর মধ্যে লিখিত আরব নাবিক ও ভৌগোলিকদের বিবরণে বাংলা সম্পর্কে বেশ গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাওয়া যায়। এই সময়কালে ইউরোপ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার মধ্যে সমুদ্র বাণিজ্যে আরবদের একাধিপত্য ছিল। বাংলার উপকূল দিয়েই আরবদের বাণিজ্যতরী যাতায়াত করতো। তাই আরবদের বর্ণনায় বাংলার সমৃদ্ধ সমুদ্র-বাণিজ্যের চিত্র পাওয়া যায়। আল ইদ্রিসি, সোলায়মান, মাসুদি, ইবন খুর্দাদবে প্রমুখদের বিবরণে চট্টগ্রাম এলাকায় আরবদের প্রভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। বাংলার দক্ষিণ-পূর্বাংশের বাণিজ্যিক সমৃদ্ধির চিত্র আরবদের বিবরণের ওপরই নির্ভরশীল।

বিদেশীদের বিবরণের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক হচ্ছে এই যে, বিদেশীরা এদেশীয় রাজনীতি নিয়ে কিছু না লিখলেও তাঁদের লেখায় সমাজ, সংস্কৃতি ও অর্থনীতির এমন অনেক দিক ধরা পড়েছে যা দেশীয় সূত্রে অনুপস্থিত। ফলে বিদেশী বিবরণে তথ্য কম থাকলেও, তাদের গুরুত্ব অপরিসীম।

ওপরের আলোচনা থেকে বোঝা যায় যে, গ্রন্থাকারে লিখিত উৎসে প্রাচীন বাংলার ইতিহাস খুব কমই পাওয়া যায়। যাও পাওয়া যায় তা ইতস্তত বিক্ষিপ্ত এবং অপর্যাপ্ত। সেই কারণেই ইতিহাস পুনর্গঠনের জন্য আমরা প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদানের ওপর অধিক নির্ভরশীল।

প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদান

অভিলেখমালা ঃ প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদানসমূহের মধ্যে অভিলেখমালাই প্রধান। আবার বিভিন্ন ধরনের অভিলেখ পাওয়া গিয়েছে। তবে এদের মধ্যে তাম্রফলকে উৎকীর্ণ ভূমি লেনদেন সংক্রান্ত দলিলাদি, যা সাধারণভাবে তাম্রশাসন বলে অভিহিত হয়, সংখ্যায়ও বেশি এবং ইতিহাসের উৎস হিসেবে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাম্রশাসন ছাড়া রয়েছে বহু মূর্তিলিপি।প্রস্তরখন্ডে উৎকীর্ণ বেশ কিছু লিপির মধ্যে রয়েছে প্রশস্তিগাঁথা ও বিভিন্ন স্মারকলিপি।এইসব অভিলেখমালায় বিধৃত তথ্য থেকেই পুনর্গঠিত হয়েছে প্রাচীন বাংলার ইতিহাসের মূল কাঠামো।

অভিলেখমালা সম্বন্ধে আলোচনার প্রারম্ভেই উল্লেখ করতে হয় বাংলার প্রাচীনতম লিপিটির। বগুড়া জেলার মহাস্থানে প্রত্নতাত্ত্বিক খননে একটি প্রস্তরখন্ডে ব্রাহ্মি লিপিতে উৎকীর্ণ অভিলেখটিই বাংলার প্রাচীনতম লিপি প্রমাণ। সম্রাট অশোকের সময়কার ব্রাহ্মি লিপির সাথে এই অভিলেখটির লিপির মিল থাকায় পন্ডিতগণ একে খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীর বলে সনাক্ত করেছেন। এই লিপিতে পুন্ড্রনগরের মহামাত্রের প্রতি রাজকীয় আদেশ লিপিবদ্ধ রয়েছে। আদেশে জনকল্যাণমুখী শাসনের স্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। এই লিপি প্রাপ্তি থেকেই মনে করা হয় যে, বাংলার উত্তরাংশ মৌর্য সাম্রাজ্যভুক্ত হয়েছিল এবং খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দী থেকেই পুন্ড্রনগর (মহাস্থান) ছিল এই অঞ্চলের প্রশাসনিক কেন্দ্র।

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, অভিলেখসমূহের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ তাম্রশাসন। এগুলোতে উৎকীর্ণ রয়েছে ভূমি লেনদেন, ক্রয়-বিক্রয় বা দান সংক্রান্ত তথ্যাদি, যা রাজকীয় অনুমোদনপ্রাপ্ত বা রাজা কর্তৃক প্রকাশিত। সব তাম্রশাসনেই উল্লেখিত হয়েছে রাজার 'জয়স্কন্ধভার' বা রাজধানীর নাম, যেখান থেকে তাম্রশাসন অনুমোদন লাভ করতো বা প্রকাশিত হতো। ভূমির অবস্থান বর্ণনা করতে গিয়ে উল্লেখিত হয়েছে প্রশাসনিক স্তরসমূহ এবং প্রশাসনিক কর্মকর্তাবৃন্দ। অধিকাংশ তাম্রশাসনে ভূমি সংক্রান্ত তথ্যাদি উল্লেখের আগে এবং তাম্রশাসনের প্রারম্ভেই স্থান পেয়েছে রাজপ্রশস্তি। রাজাদের সভাকবি কর্তৃক রচিত প্রশস্তিতে রাজার এবং তাঁর পূর্বপুরুষদের গুণকীর্তন করা হয়েছে। কাব্যাকারে রচিত এই প্রশস্তিতে কবি রাজাদের কৃতিত্বকে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে বলার চেষ্টা করেছেন ঠিকই। তা সত্তেও অতিরঞ্জিত বক্তব্যের মধ্যেই ধরা পড়েছে ঐতিহাসিক সত্য। আধুনিক ঐতিহাসিককে এই অতিরঞ্জিত বক্তব্য থেকে সত্য উদ্‌ঘাটনে সতর্ক থাকতে হয়; বিচারবুদ্ধি প্রয়োগ করে এবং অন্যান্য সূত্রে প্রাপ্ত তথ্যাদির সাথে মিলিয়ে পুনর্গঠন করতে হয় প্রাচীন যুগের ইতিহাস।তাম্রশাসনসমূহের প্রশস্তি অংশই প্রাচীন বাংলার ইতিহাসের প্রধান উপকরণ, একথা বললেও বোধ হয় ভুল হবে না। মোট কথা, তাম্রশাসনসমূহে প্রাপ্ত বিভিন্ন তথ্যই প্রাচীন যুগের ইতিহাস পুনর্গঠনে মুখ্য ভূমিকা পালন করেছে।

তাম্রশাসনের প্রশস্তি ছাড়াও কিছু প্রশস্তি প্রস্তর খন্ডে বা স্তম্ভে উৎকীর্ণ হয়েছে। বাদল স্তম্ভলিপিতে বিধৃত রয়েছে পাল সম্রাট ধর্মপাল ও দেবপাল-এর সময়কার মন্ত্রীপরিবারের কীর্তিগাঁথা। তেমনি দেওপাড়া প্রশস্তি আমাদের জন্য রয়েছে সেন রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা বিজয়সেনের কৃতিত্বের বিস্তারিত বিবরণ।

মূর্তিলিপি বা স্মারকলিপি সমূহে খুব সামান্য তথ্যই থাকে। মূর্তি তৈরি বা কোন সৌধ/মন্দির নির্মাণের কাল এবং ঐ সময়ের রাজার নাম হয়তো এইসব লিপিতে থাকে, রাজাদের কাল নির্ণয়ে তা কিছুটা সাহায্য করে। তবে বাংলার প্রাচীন যুগের লিপিসমূহের একটা বৈশিষ্ট্য এ ব্যাপারে কিছু অসুবিধার সৃষ্টি করেছে। বাংলার অভিলেখসমূহে সময়কাল উল্লেখিত হয়েছে রাজাদের রাজ্যাঙ্কে, কোন নির্দিষ্ট সনে নয়। তাই রাজাদের সময়কাল নির্ধারণে অনেক ক্ষেত্রেই লিপিতাত্ত্বিক বিচারের সাহায্য নিতে হয়।

(খ) মুদ্রা

বাংলার প্রাচীন যুগের ইতিহাস পুনর্গঠনে মুদ্রা সাহায্যকারী ভূমিকা পালন করে। মৌর্য যুগ থেকে এই অঞ্চলে ছাপাঙ্কিত মুদ্রার প্রচলন ছিল। কুষাণ-পরবর্তী যুগ থেকে ছাঁচে ঢালা মুদ্রার ব্যবহার দেখা যায়। সমগ্র বাংলার বিভিন্ন জায়গায় গুপ্ত সম্রাটদের স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রা বিপুল সংখ্যায় আবিষ্কৃত হয়েছে। বাংলার সম্রাট শশাঙ্কের আমলের ও স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রা পাওয়া গিয়েছে। দক্ষিণ-পূর্ব বাংলায় বেশ কিছু স্থানীয় রাজাদের রৌপ্য মুদ্রাও পাওয়া গিয়েছে। তবে বাংলার পাল বা সেন বংশের রাজাদের কোন মুদ্রা আজ পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয়নি।

মুদ্রা সার্বভৌমত্বের পরিচয় বহন করে। তবে যুগের অর্থনৈতিক অবস্থার সূচক হিসেবে মুদ্রাকে ধরা যায়। গুপ্ত যুগে বাংলার সমৃদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায় ঐ যুগের বিপুল সংখ্যক মুদ্রা প্রাপ্তি থেকে। দক্ষিণ-পূর্ব বাংলায় রৌপ্য মুদ্রা প্রাপ্তিও ঐ অঞ্চলের বাণিজ্যিক সমৃদ্ধিরই পরিচয় বহন করে। বাণিজ্যের মাধ্যমেই সোনা বা রূপা আসতো, আর তা দিয়েই মুদ্রা তৈরি করা হতো। বড় আকারের বাণিজ্যিক লেনদেনে স্বর্ণ বা রৌপ্য মুদ্রার ব্যবহার হতো। সাধারণ কেনা বেচায় ব্যবহৃত হতো কড়ি। এ দেশের অর্থনীতিতে কড়ির ব্যবহার বহু দিন পর্যন্ত প্রচলিত ছিল।

পাল-সেন শাসনামলের মুদ্রার অনুপস্থিতি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে এ কথাই বলা যায় যে, ঐ সময়ে বাংলার অর্থনীতি ছিল কৃষি নির্ভর, বহির্বিশ্বের সাথে তেমন একটা বাণিজ্য ছিল না। অন্তর্ভারতীয় যে বাণিজ্য ছিল তা সম্ভবত পূর্বের স্বর্ণ বা রৌপ্য বা রৌপ্যমুদ্রা ব্যবহার করেই চলতো। পাল বা সেন রাজারা নিজেদের মুদ্রা জারি করার প্রয়োজনবোধ করেননি। অষ্টম থেকে দশম শতাব্দীর মধ্যে দক্ষিণ-পূর্ব বাংলার বহির্বাণিজ্যের যে পরিচয় আরবদের লেখনি থেকে পাওয়া যায়, তারই সমর্থন মেলে এই অঞ্চলে প্রাপ্ত রৌপ্য মুদ্রা থেকে। তবে একথা বলতেই হয় যে, প্রাচীন বাংলার ইতিহাস পুনর্গঠনে মুদ্রা সম্পূরক ভূমিকা পালন করে।

(গ) প্রত্নতাত্ত্বিক ধ্বংসাবশেষ

প্রত্নতাত্ত্বিক উদ্‌ঘাটনের ফলে প্রাচীন বাংলার ইতিহাস এখন অনেক সমৃদ্ধ। বিগত অর্ধশতাব্দীর অধিক সময়ে বাংলাদেশ ও পশ্চিম বাংলায় প্রত্নতাত্ত্বিক উৎখননের ফলে আবিষ্কৃত হয়েছে বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রত্নস্থল। এসব আবিষ্কার বাংলার প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে শুরু করে দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত ইতিহাসের অনেক নতুন উপকরণ সংযোজন করেছে। তাই নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, প্রত্নতাত্ত্বিক ধ্বংসাবশেষ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উপাদান।

বর্তমান বাংলাদেশে প্রাপ্ত প্রত্নতাত্ত্বিক ধ্বংসাবশেষের মধ্যে বগুড়া জেলার মহাস্থান, নওগাঁ জেলার পাহাড়পুর, নরসিংদী জেলার ওয়ারি-বটেশ্বর এবং কুমিল্লা জেলার ময়নামতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। মহাস্থানে আবিষ্কৃত হয়েছে বাংলার প্রাচীনতম নগর- পুন্ড্রনগরের ধ্বংসাবশেষ। খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দী থেকে দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত বাংলার ইতিহাসের বিভিন্ন পর্যায়ের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে মহাস্থানে প্রাপ্ত বিভিন্ন প্রত্নসামগ্রীতে।করতোয়া নদীর ধারে গড়ে উঠেছিল সমৃদ্ধ নগরসভ্যতা।বাংলার হিন্দু-বৌদ্ধ যুগের জীবনযাত্রার অনেক ইঙ্গিতই মেলে মহাস্থানের ধ্বংসাবশেষে। প্রাচীন যুগের শিল্পকলা- ভাস্কর্য, পোড়ামাটির ফলক, স্থাপত্য- নিদর্শনাদি উৎঘাটিত হয়েছে এই প্রত্নস্থলে।

পাহাড়পুরে উদ্‌ঘাটিত হয়েছে পাল সম্রাট ধর্মপালের কীর্তি সোমপুর মহাবিহার। এই বৌদ্ধ বিহারটি ভারতীয় উপমহাদেশের সর্ববৃহৎ বিহার। এই বিহারের স্থাপত্য পরিকল্পনা ও নির্মাণশৈলী ঐ যুগের শৈল্পিক উকর্ষের প্রমাণ বহন করে। পাহাড়পুরে প্রাপ্ত পোড়ামাটির ফলকসমূহ এক দিকে যেমন বাংলায় এই শিল্পের চরম উৎকর্ষের প্রমাণ, অন্যদিকে এই ফলকসমূহে বিধৃত রয়েছে আবহমান বাংলার জনজীবনের চিত্র। এই দিক থেকে এ ফলকসমূহ ইতিহাসের অত্যন্ত গুরুত্বপুর্ণ উপাদান। জনজীবনের চিত্র অন্যান্য উৎসে খুবই বিরল। ওয়ারী-বটেশ্বরে ইদানিং কিছু প্রত্নানুসন্ধানে প্রতিপন্ন হয়েছে যে, এখানেও প্রাচীন যুগের মানব সভ্যতার নিদর্শনাদি রয়েছে।

বাংলার দক্ষিণ-পূর্বাংশের সবচেয়ে গুরুত্বপুর্ণ প্রত্নস্থল ময়নামতি। লালমাই পাহাড়কে ঘিরে গড়ে উঠেছিল এক বিশাল বৌদ্ধ সভ্যতার কেন্দ্র, সপ্তম শতাব্দী থেকে একাদশ শতাব্দীর মধ্যে। লালমাই-ময়নামতি এলাকায় প্রত্ন খননের ফলে উদ্‌ঘাটিত হয়েছে বেশ কয়েকটি বৌদ্ধ বিহারের ধ্বংসাবশেষ– শালবন বিহার, আনন্দ বিহার, ভোজ বিহার প্রমুখ। খড়্গ, দেব ও চন্দ্র বংশীয় রাজাদের কীর্তিসমূহ আমাদের ইতিহাসে সংযোজন করেছে নতুন মাত্রা।তাম্রশাসনাদিতে উল্লেখিত দেব বংশীয় রাজাদের রাজধানী শহর 'দেবপর্বত'-এর অবস্থান যে লালমাই এলাকাতেই সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই, তবে এখনও সঠিকভাবে নির্ধারণ করা সম্ভব হয়নি এর অবস্থান। ময়নামতির প্রত্নসামগ্রী বাংলার ইতিহাসে, তথা দক্ষিণ-পূর্ব বাংলার ইতিহাসে অনেক নতুন তথ্য সরবরাহ করেছে, যার ফলে এই অঞ্চলের ইতিহাস এখন অনেকখানি স্পষ্ট, অনেকখানি বিস্তারিত।

পশ্চিম বাংলার প্রত্নস্থলসমূহের মধ্যে বাকুড়া জেলার পান্ডুরাজার ঢিবি, মেদেনীপুর জেলার তমলুক, উত্তর চব্বিশ পরগণার চন্দ্রকেতুগড়, মালদা জেলার জগ্‌জীবনপুর, মুর্শিদাবাদ জেলার রাজবাড়ীডাঙ্গা আর পশ্চিম দিনাজপুর জেলার বাণগড় বিশেষ উল্লেখযোগ্য। পান্ডুরাজার ঢিবিতে আবিষ্কৃত হয়েছে তাম্রপ্রস্তর যুগের সভ্যতার নিদর্শন। তমলুকের প্রত্ননিদর্শানাদিকে সনাক্ত করা হয়েছে প্রাচীন বন্দরনগরী তাম্রলিপ্তির বলে। তাম্রলিপ্তিকে অনেকেই গ্রিক-লাতিন লেখনির 'গাঙ্গে' বন্দর বলে মনে করেন। চন্দ্রকেতুগড় ধরে রেখেছে বাংলার ইতিহাসের প্রাথমিক পর্যায়ের নগর সভ্যতার নিদর্শন। বাণিজ্য-ভিত্তিক সমৃদ্ধির ওপর গড়ে উঠেছিল এই নগর, যার ছায়ায় বিকাশ লাভ করেছিল শিল্পকলার বিভিন্ন দিক। চন্দ্রকেতুগড়ে প্রাপ্ত পোড়ামাটির শিল্পনিদর্শনাদি বিস্ময়কর উৎকর্ষের প্রমাণ বহন করে। জগ্‌জীবনপুরে পাল যুগের একটি তাম্রশাসনসহ বৌদ্ধ সংস্কৃতির অনেক নিদর্শন অধুনা আবিষ্কৃত হয়েছে।রাজবাড়ীডাঙ্গায় আবিষ্কৃত হয়েছে রক্তমৃত্তিকা মহাবিহারের ধ্বংসাবশেষ, আর তারই উপকণ্ঠে শশাঙ্কের রাজধানী কর্ণসুবর্ণ। বাণগড়ের ধ্বংসাবশেষ বহন করেছে প্রাচীন 'বিষয়'-এর অধিষ্ঠান কোটিবর্ষ নগরের চিহ্ন।

এই সব প্রত্নস্থান উদ্‌ঘাটনের ফলে প্রাচীন বাংলার ইতিহাসের কঙ্কালসার কাঠামোতে সংযোজিত হয়েছে রক্ত-মাংস। অন্যান্য প্রত্নতাত্ত্বিক এবং লিখিত উপাদান থেকে আহরিত তথ্যাদির ওপর নির্ভর করে যে ইতিহাস পুনর্গঠিত হয়েছে তা অনেকটা পরিপূর্ণতা লাভ করেছে প্রত্ন খননে প্রাপ্ত নিদর্শনাদির আলোকে। প্রাচীন বাংলার ইতিহাস এখন অনেকটা স্পষ্ট। তবে স্থান বিশেষে যে এখনও অস্পষ্টতা বিরাজ করছে, সে কথা স্বীকার করতেই হয়।

(খ) সুলতানি যুগের ইতিহাসের উৎস

ভারতীয় উপমহাদেশে মুসলিম আগমনের পর ইতিহাসের উৎসের অভাব অনেকাংশে কমেছে। মুসলমান শাসকগণ তাঁদের কীর্তিকলাপ লিপিবদ্ধকরণের দিকে যথেষ্ট যত্নবান ছিলেন। তাঁদের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করে অনেকেই রচনা করেছেন ঘটনাপঞ্জি। এই সব রচনা প্রকৃত অর্থে ইতিহাস না হলেও, এদের মধ্যে ধরা পড়েছে অনেক তথ্য যা ইতিহাস পুনর্গঠনে যথেষ্ট সাহায্য করে। মুসলিম শাসকদের পৃষ্ঠপোষকতায় ইতিহাস শাস্ত্রেরও বিকাশ ঘটেছিল ভারতবর্ষে। সুতরাং মধ্যযুগের ইতিহাস পুনর্গঠনে এসব লেখনি অত্যন্ত মূল্যবান উপাদান।বাংলার সুলতানি যুগের ইতিহাস রচনায় দিল্লিতে লেখা গ্রন্থাদি গুরুত্বপূর্ণ উৎস হিসেবে বিবেচিত। তাছাড়া স্থানীয়ভাবে রচিত বাংলা সাহিত্য থেকেও ইতিহাসের উপাদান পাওয়া যায়।এদের সাথে সাহায্যকারী ভূমিকা পালন করে বিদেশীদের বিবরণ। গ্রন্থাকারে লিখিত উপাদান ছাড়াও সুলতানি যুগের ইতিহাসের অনেক তথ্য পাওয়া যায় সে যুগের লিপিমালায় এবং মুদ্রায়।আমরা আলোচনার সুবিধার্থে সুলতানি যুগের ইতিহাসের উৎসসমূহকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করে একে একে আলোচনা করবো।

দিল্লিতে রচিত ঘটনাপঞ্জি ও ইতিহাস

বাংলায় মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠার প্রাথমিক পর্যায়ের ইতিহাসের জন্য আমাদের নির্ভর করতে হয় দিল্লি কেন্দ্রিক ফার্সি ভাষায় রচিত গ্রন্থাদির ওপর। দিল্লির সুলতান নাসিরুদ্দিন মাহ্‌মুদের শাসনামলে রচিত মিনহাজ-উস-সিরাজের 'তাবকাৎ-ই-নাসিরি' গ্রন্থে বখতিয়ার খলজীর বাংলা বিজয় থেকে ১২৬০ খ্রিস্টাব্দ

পর্যন্ত সময়ের তথ্য পাওয়া যায়। মিনহাজের গ্রন্থটি সামগ্রিকভাবে ইসলামী বিশ্বের ইতিহাস। সেই প্রেক্ষাপটে ভারতে ইসলামের বিস্তার এবং সেই সূত্র ধরে বাংলায় মসলিম শাসন বিস্তার তাঁর গ্রন্থে স্থান পেয়েছে। মিনহাজ স্বল্পকালের জন্য বাংলায় এসেছিলেন, তবে দিল্লিতে বসেই তিনি তাঁর গ্রন্থটি রচনা করেছিলেন। বখতিয়ারের বাংলা বিজয় এবং তদ্‌পরবর্তী খলজী মালিকদের ইতিহাসের জন্য মিনহাজই একমাত্র উৎস। যেহেতু তিনি দিল্লির সুলতানের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেছিলেন, সেহেতু দিল্লির সুলতানের পক্ষ অবলম্বন তাঁর পক্ষে খুবই স্বাভাবিক। দিল্লি-বাংলা দ্বন্দ্বের ক্ষেত্রে তিনি দিল্লির পক্ষেই কথা বলেছেন। মিনহাজের বর্ণনায় অনেক অস্পষ্টতা এবং ভুলভ্রান্তি লক্ষ করা যায়। এতদ্‌সত্ত্বেও ১২৬০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত সময়ের জন্য মিনহাজই একমাত্র উৎস। হাসান নিজামি রচিত 'তাজুল মাসির' গ্রন্থে কুতুবউদ্দিন আইবকের সময়ের কিছু তথ্য পাওয়া গেলেও বাংলার ইতিহাসের জন্য তা তেমন গুরুত্বপূর্ণ নয়।

বাংলার তথা সমগ্র ভারতবর্ষের ইতিহাসের জন্য জিয়াউদ্দিন বারাণী রচিত 'তারিখ-ই-ফিরোজশাহী' গ্রন্থটি অত্যন্ত মূল্যবান উৎস। বারাণী গ্রন্থ রচনায় দিল্লির সুলতান ফিরোজ শাহ তুঘলকের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেছিলেন। এ গ্রন্থে ১২৬৬ থেকে, অর্থাৎ বলবনের রাজত্বকাল থেকে ফিরোজ তুঘলকের রাজত্বের প্রথম সাত বছরের (১৩৫৭ পর্যন্ত) ইতিহাস স্থান পেয়েছে। দিল্লি সালতানাতের ইতিহাস লেখাই ছিল বারাণীর মুখ্য উদ্দেশ্য। সেই সূত্রে দিল্লির সাথে বাংলার বিরোধের তথ্যাদি বারাণীর গ্রন্থে ধরা পড়েছে। বলবনের বাংলা আক্রমণ ও তদ্‌পরবর্তী সময়ে বাংলার ঘটনাবলি, গিয়াসউদ্দিন তুঘলকের বাংলা আক্রমণ, মুহাম্মদ বিন তুঘলকের নেয়া বাংলার প্রশাসনিক ব্যবস্থা, ফিরোজ তুঘলকের সাথে বাংলার সুলতান ইলিয়াস শাহের সংঘর্ষ প্রভৃতি বিষয়ে বারাণীর গ্রন্থই প্রধান উৎস। তবে বারাণীর ইতিহাসে কিছুটা আধুনিক ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গী লক্ষ করা গেলেও তিনি যে দিল্লির পক্ষের লোক এ কথা তিনি কখনও ভুলে যাননি। তবে তাঁর সময়ের ইতিহাসের জন্য আমরা তাঁর কাছে ঋণী। অবশ্য বারাণীর সমসাময়িক ঐতিহাসিক শামস্-ই-সিরাজ আফিফ রচিত 'তারিখ-ই-ফিরোজশাহী' গ্রন্থেও অনেক সম্পূরক তথ্য পাওয়া যায়।

আমীর খসরু রচিত 'কিরান-উস-সাদাইন' গ্রন্থে বাংলার ইতিহাসের একটি বিশেষ ঘটনা স্থান পেয়েছে। এ কথা সবারই জানা যে, আমীর খসরুর প্রতিটি রচনাই এক একটি ঐতিহাসিক ঘটনাকে কেন্দ্র করে। ওপরে উল্লেখিত গ্রন্থটি রচিত হয়েছিল বাংলার সুলতান বুঘরা খান ও তাঁর ছেলে কায়কোবাদের মধ্যে বিরোধ এবং বিরোধ অবসানের ঘটনাকে কেন্দ্র করে। সুলতান বলবনের মৃত্যুর পর বুঘরা খান দিল্লির সিংহাসন অধিকারের আহ্বান প্রত্যাখ্যান করে বাংলাতেই থেকে যান, দিল্লির সিংহাসন অধিকার করেন বুঘরা খানেরই পুত্র কায়কোবাদ। পুত্র দিল্লির সিংহাসনে অধিষ্ঠিত থাকায় বুঘরা খান নিজেকে স্বাধীন বলে ঘোষণা করেন। কিন্তু পুত্র প্রাদেশিক শাসনকর্তা পিতার স্বাধীন আচরণ মেনে নিতে অস্বঈকার করেন এবং পিতাকে বশে আনার উদ্দেশ্যে যুদ্ধ যাত্রা করেন। পিতাও সৈন্য-সামন্ত নিয়ে পুত্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে এগিয়ে যান। বিহারের সরজু নদীর তীরে পিতা-পুত্রের সাক্ষাৎ হয়। পরে উভয়ের মধ্যে সমঝোতা হয়। এই ঘটনাকে বিষয়বস্তু করে রচিত হয়েছিল আমীর খসরুর 'কিরান-উস-সাদাইন' গ্রন্থ।বুঘরা খান ও কায়কোবাদের মধ্যে এই সংঘর্ষের একমাত্র সূত্র আমীর খসরুর এই গ্রন্থ।

বাংলায় স্বাধীন সুলতানি প্রতিষ্ঠিত হয় ১৩৩৮ খ্রিস্টাব্দে।ইলিয়াস শাহ কর্তৃক স্বাধীন সুলতানি দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর বাংলা দীর্ঘকাল স্বাধীনতা ভোগ করে, দিল্লির সাথে সম্পূর্ণভাবে সম্পর্কচ্ছেদ ঘটে। ফলে দিল্লিতে লেখা ইতিহাসে বাংলা সম্বন্ধে তথ্য তেমন আর পাওয়া যায় না। বাংলার স্বাধীনতার সমাপ্তি ঘটে ১৫৩৮ খ্রিস্টাব্দে, শেরশাহ সুরের বাংলা অধিকার করার মধ্যদিয়ে। শের শাহের বাংলা অধিকারের ইতিহাস পাওয়া যায় আব্বাস শেরওয়ানীর 'তারিখ-ই-শেরশাহী' গ্রন্থে।

মুঘল যুগের বিভিন্ন গ্রন্থে বাংলার সুলতানি যুগের ঘটনাবলির উল্লেখ পাওয়া যায়। এদের মধ্যে আবুল ফজলের 'আইন-ই-আকবরী' ও 'আকবরনামাহ', নিজামউদ্দিন আহমদ বখশীর 'তাবাকাৎ-ই-আকবরী' ইত্যাদি গ্রন্থ উল্লেখযোগ্য। মুগল যুগের লেখকগণ সমসাময়িক ইতিহাস লিপিবদ্ধ করতে গিয়ে পূর্বের ঘটনাবলির জের টেনে সুলতানি যুগের অনেক ঘটনার উল্লেখ করেছেন। তাদের কাছে এমন অনেক গ্রন্থ বা

সূত্র ছিল যার ভিত্তিতে তারা ঐসব ঘটনা উল্লেখ করেছেন। আমাদের কাছে ঐসব সূত্র এসে পৌঁছায়নি। তাই মুগল যুগের ইতিহাস গ্রন্থাদিতে সুলতানি যুগের বাংলার ইতিহাসের অনেক তথ্য পাওয়া যায়।

বাংলার ভূখন্ডে সুলতানি যুগে বা মুগল যুগে এমন কোন গ্রন্থ রচিত হয়নি যার মধ্যে সুলতানি যুগের ইতিহাস ধরা পড়েছে। পলাশীর যুদ্ধের ২১ বছর পর ফার্সি ভাষায় রচিত গোলাম হোসেন সলিমের 'রিয়াজ-উস-সালাতীন'-ই প্রথম গ্রন্থ যার মধ্যে বাংলার মুসলিম শাসনামলের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস লিপিবদ্ধ রয়েছে। ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কর্মচারী জর্জ উড্‌নীর পৃষ্ঠপোষকতায় তাঁর মুনশী গোলাম হোসেন সলিম 'রিয়াজ-উস-সালাতীন' রচনা করেছিলেন বিভিন্ন দলিল দস্তাবেজ ও গ্রন্থাদির ভিত্তিতে, যেগুলো তাঁর সময়ে ছিল। সেসব সূত্রের অনেকগুলোই আমাদের কাছে এসে পৌঁছায়নি। সলিম বাংলায় মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠা থেকে তাঁর সময়কাল পর্যন্ত অর্থাৎ অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি কাল পর্যন্ড় ধারাবাহিক ইতিহাস রচনায় প্রয়াসী হয়েছিলেন। তবে তথ্যের অভাবের কারণে জায়গায় জায়গায় তিনি স্পষ্ট বা ধারাবাহিকভাবে বর্ণনা করতে পারেননি। সলিমের কাছাকাছি সমাজের জন্য 'রিয়াজ-উস-সালাতীন' অনেক মূল্যবান তথ্য সরবরাহ করে। তবে পূর্বের ঘটনার জন্য রিয়াজে প্রাপ্ত তথ্য কেবল তখনই গ্রহণযোগ্য যখন অন্য কোন সূত্র থেকে সমর্থন পাওয়া যায়। এসব দুর্বলতা থাকা সত্ত্বেও 'রিয়াজ-উস-সালাতীন' বাংলার ইতিহাসের একটি আকর গ্রন্থ হিসেবে বিবেচিত হওয়ার দাবি রাখে।

স্থানীয় সাহিত্য

সুলতানি বাংলার দরবারি ভাষা ছিল ফার্সি। তবে সাধারণ মানুষের ভাষা ছিল বাংলা। মুসলমান সুলতানদের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করে এ যুগে বাংলা ভাষার ব্যাপক প্রসার ঘটে। বিশেষ করে স্বাধীন সুলতানি প্রতিষ্ঠা ও দিল্লির সাথে সম্পূর্ণভাবে সম্পর্কচ্ছেদের পর সুলতানগণ এদেশের জনগণের সমর্থন লাভের উদ্দেশ্যে উদার শাসননীতির প্রবর্তন করেন। এই উদার শাসননীতির ক্রমধারায় তাঁরা পৃষ্ঠপোষকতা দান করেন এদেশীয় ভাষা ও সাহিত্যের বিকাশের ক্ষেত্রে। ফলে সুলতানি যুগের বৈশিষ্ট্য হয়ে দাঁড়ায় বাংলা সাহিত্যের বিকাশ। হিন্দু-বৌদ্ধ শাসনামলে এদেশের জনগণের ভাষায় সাহিত্যের বিকাশ ঘটতে পারেনি; রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতা পেয়েছে দেবভাষা সংস্কৃত। বাংলার সুলতানি যুগে তাই হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের অবদানের ফলে বাংলা ভাষায় যে অসংখ্য সাহিত্য রচিত হয়েছে তাতে ধরা পড়েছে সমসাময়িক সামাজিক-রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক ইতিহাসের অনেক তথ্য। মঙ্গল কাব্যে বিধৃত সমাজচিত্র, বা মুসলিম সাহিত্যে তদানীন্তন ইসলাম সম্পর্কিত তথ্য ইতিহাসের অমূল্য সম্পদ। ধর্মীয়-সামাজিক ইতিহাসের জন্য এসব সাহিত্যিক উপকরণের মূল্য অপরিসীম।

বিদেশী বিবরণ

সুলতানি যুগের ইতিহাসের উপাদান হিসেবে বিদেশীদের বর্ণনাও গুরুত্বপূর্ণ। সংখ্যায় কম হলেও কয়েকটি বিদেশী বিবরণ পাওয়া যায় তাতে সামাজিক ও অর্থনৈতিক ইতিহাসের যেসব তথ্য পাওয়া যায় তা দেশীয় সূত্রে বিরল। এ কারণেই বিদেশী বিবরণের গুরুত্ব অপরিসীম। ১৩৪৬-৪৭ খ্রিস্টাব্দে বাংলায় এসেছিলেন মরক্কোর বিশ্ব-পর্যটক ইবনে বতুতা। তিনি অবশ্য দিল্লিতে এসেছিলেন ১৩২৯-৩০ খ্রিস্টাব্দে; উত্তর ভারতে বেশ কিছুকাল অবস্থান করে দক্ষিণ ভারত হয়ে তিনি বাংলায় এসেছিলেন সমুদ্রপথে। তিনি চট্টগ্রাম বন্দর হয়ে সোনারগাঁয়ে আসেন, সেখান থেকে যান সিলেটে বিখ্যাত সুফি সাধক হযরত শাহজালাল (রাঃ)-এর সাথে দেখা করতে। সিলেটে কিছুকাল অবস্থান করে সোনারগাঁয়ে এসে এক চীনা নৌযানে তিনি দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দিকে পাড়ি দিয়েছিলেন। এই স্বল্পকালীন বাংলা সফরের বর্ণনা রয়েছে তাঁর 'রেহালা'তে। ইবনে বতুতা যেমন মুগ্ধ হয়েছিলেন বাংলার প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে, তেমনি অবাক হয়েছিলেন বাংলার সুলভ জীবনযাত্রা দেখে। বাংলার বিভিন্ন জিনিসপত্রের মূল্যের উল্লেখ রয়েছে তাঁর ভ্রমণবৃত্তান্তে। নদীপথে ভ্রমণের সময় ডাকাতের ভয়ের কথাও তিনি উল্লেখ করেছেন, তেমনি উল্লেখ করেছেন হাটে-বাজারে ছেলেমেয়ে ক্রয়-বিক্রয়ের কথা।বাংলার আবহাওয়া তাঁর ভাল লাগেনি। তাই বাংলাকে তিনি আখ্যায়িত করেছেন, 'দোযখ-আজ পুর-ই-নিয়ামত' (নিয়ামতপূর্ণ দোযখ) বলে। ইবনে বতুতার বিবরণে যে ধরনের আর্থ-

সামাজিক তথ্য রয়েছে তা দেশীয় উপাদানে অনুপস্থিত। সেই কারণেই তাঁর বিবরণ এতো গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচনা করা হয়।

পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথম দিকে চীনের সাথে বাংলার সুলতানদের কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছিল এবং বেশ কয়েকবার দূত বিনিময় হয়েছিল। চীনা দূতদের সাথে দোভাষী হিসেবে চার বার বাংলায় এসেছিলেন মা-হুয়ান। ফিরে গিয়ে মাহুয়ান তাঁর বাংলার অভিজ্ঞতা লিখে রেখে গেছেন। এই বিবরণ তদানীন্তন বাংলার সামাজিক ও অর্থনৈতিক ইতিহাসের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। বেশভূষা, রীতিনীতি, আমোদ-প্রমোদ, কৃষি উৎপাদন, যোগাযোগ ব্যবস্থা প্রভৃতি বিষয়ে অনেক তথ্য পাওয়া যায় মা-হুয়ানের বিবরণে। তবে এই বিবরণে কেবল স্থান পেয়েছে সমাজের উচ্চ শ্রেণীর কথা, কারণ মা-হুয়ান উচ্চ শ্রেণীর সাথেই মেশার সুযোগ পেয়েছিলেন। আংশিক হলেও মা-হুয়ানের দেওয়া তথ্য সেই সময়কার আর্থ-সামাজিক ইতিহাসের অতি মূল্যবান উপাদান।

ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম দিকে লিখিত পর্তুগিজ টোমে পিরেজের 'সুমা ওরিয়েন্টালা' গ্রন্থে বাংলা সম্বন্ধে, বিশেষ করে বাংলার ব্যবসায়-বাণিজ্য সম্পর্কে বেশ গুরুত্বপূর্ণ তথ্য আছে। তেমনি বারবোসার বিবরণেও অনেক তথ্য পাওয়া যায়। পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ দিকে বাংলায় পর্তুগিজদের আগমন বাংলার ইতিহাসে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা।বাংলার অর্থনীতিতে ইউরোপীয়দের আগমন নিঃসন্দেহে তাৎপর্যপূর্ণ। ষোড়শ শতাব্দীতে বাংলায় পর্তুগিজদের অবস্থান বাংলার বাণিজ্যে যেমন প্রভাব রেখেছে, তেমনি বাংলার সমাজ-সংস্কৃতিতে, কৃষিতে, ভাষা ও সাহিত্যে পর্তুগিজদের প্রভাবের কথা সবাই স্বীকার করেছেন। ফলে পর্তুগিজদের লেখনিসমূহ বাংলার ইতিহাসের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উৎস।

ওপরের আলোচনা থেকে স্পষ্টই বোঝা যায় যে, গ্রন্থাকারে রচিত সাহিত্যিক উপকরণকে ভিত্তি করেই মূলত সুলতানি যুগের ইতিহাস পুনর্গঠিত হয়েছে। তবে প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদান থেকেও যথেষ্ট সাহায্য পাওয়া যায়। প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদানের মধ্যে এ যুগের ইতিহাসে মুদ্রার ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। লিপিমালারও সাহায্যকারী ভূমিকা রয়েছে। ধ্বংসপ্রাপ্ত প্রত্নস্থল থেকেও ইতিহাসের উপাদান সংগ্রহ করা হয়ে থাকে।

মুদ্রা

বখতিয়ার খলজী থেকে শুরু করে সুলতানি যুগের শেষ পর্যন্ত প্রায় সব সুলতানেরই মুদ্রা বাংলার বিভিন্ন জায়গা থেকে আবিষ্কৃত হয়েছে। আর এই মুদ্রার ওপর ভিত্তি করেই নির্ধারিত হয়েছে বাংলার সুলতানদের কালানুক্রম এবং রাজত্বকাল। এক্ষেত্রেই মুদ্রার ভূমিকা সবচেয়ে বেশি। মুসলমান শাসকদের মুদ্রায় উৎকীর্ণ থাকে সন-তারিখ, শাসকদের উপাধি ও টাকশালের নাম। অনেক সময় কোন বিশেষ বিজয় বা ঘটনাকে উদ্দশ্য করেও মুদ্রা জারি করা হতো। মুদ্রায় অনেক সময় প্রশাসনিক কর্মকর্তা বা বিভাগেরও উল্লেখ পাওয়া যায়। মুদ্রায় প্রাপ্ত তথ্যসমূহের প্রমাণিকতা সম্বন্ধে সন্দেহের কোন অবকাশ থাকে না। খিলাফতের প্রতি বাংলার সুলতানদের মনোভাব অনেক সময় মুদ্রায় উৎকীর্ণ উপাধি থেকে অনুমান করা সম্ভব।

তাছাড়া মুদ্রার ভিত্তিতে সমসাময়িক অর্থনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে ধারণা করা সম্ভব। মুদ্রার ওজন, মুদ্রায় ব্যবহৃত সোনা বা রূপার মান এবং প্রাপ্ত মুদ্রার সংখ্যা থেকে অর্থনৈতিক অবস্থার স্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া। টাকশালের নাম সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি সম্পর্কেও ধারণা দেয়।

লিপিমালা

বাংলার সুলতানি যুগের অধিকাংশ লিপিই প্রস্তরখন্ডে উৎকীর্ণ নির্মাণ-স্মারক লিপি।মসজিদ বা মাদরাসা নির্মাণের স্মৃতিবহনকারী লিপিসমূহে নির্মাতাদের নাম ও নির্মাণের সময়কাল, অবস্থানের প্রশাসনিক পরিচয়, নির্মাতাদের পদবী এবং উপাধি সব তথ্যই ইতিহাস পুনর্গঠনে সাহায্য করে।এই লিপিমালায় ঐ যুগের একটি বিশেষ শিল্পের উৎকর্ষেরও প্রমাণ পাওয়া যায়। মুসলিম শাসনকালে হস্তলিপি শিল্পের বিশেষ বিকাশ ঘটে। আর এই বিকাশের সাক্ষ্য রয়েছে অসংখ্য লিপিতে। বাংলার ভূভাগে বিশেষ কিছু লিপিরীতিরও উন্মেষ ঘটেছিল; তার মধ্যে তীর-ধনুকের আকৃতিকে ভিত্তি করে বাংলার তুঘরা রীতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

ধ্বংসপ্রাপ্ত প্রত্নস্থল

সুলতানি যুগের অনেক নগরই আজ আর তাদের আদিরূপ নিয়ে দাঁড়িয়ে নেই। ধর্মীয় স্থাপত্য ছাড়া অন্যান্য স্থাপত্য কর্ম আজ প্রায় বিলীন হবার পথে। গৌড়-লখনৌতি, পান্ডুয়া বা সোনারগাঁ সবই আজ স্মৃতি। মধ্যযুগীয় আড়ম্বরপূর্ণ পরিবেশ আজ আর চোখে পড়ে না। ধ্বংসস্তুপের মধ্যেই খুঁজতে হয় অতীতকে। বিদেশী বা দেশীয় লেখনিতে এককালের সমৃদ্ধ নগরের যে চিত্র পাওয়া যায়, তা আর মিলবে না আজকের ধ্বংসপ্রাপ্ত অবয়বের সাথে। তবুও ধ্বংসের মধ্যেই ঐতিহাসিকরা খুঁজে বেড়ান অতীতের উপাদান।

তবে সুলতানি যুগের ধর্মীয় স্থাপত্যের বেশ কিছু নিদর্শন এখনও বিদ্যমান। মুসলিম শাসনকালের স্থাপত্যশিল্পের চরম উৎকর্ষের প্রমাণ পাওয়া যায় এদের মধ্যেই। গৌড়ের বড় সোনা মসজিদ, ছোট সোনা মসজিদ, বাগেরহাটের ষাট গম্বুজ মসজিদ বা সোনারগাঁর সন্নিকটে গোয়াল্‌দী মসজিদ– সবই শিল্পকলার উৎকর্ষের পরিচায়ক।

উপসংহারে একথা বলা যায় যে, সুলতানি যুগের ইতিহাস বহুলাংশে দিলি- কেন্দ্রিক লিখিত উপাদানের ওপর নির্ভরশীল। বাংলার সুলতানদের দরবারে ইতিহাস লিপিবদ্ধকরণের কোন প্রচেষ্টাই লক্ষ করা যায় না। তাই হয়তো প্রথম দিকে অনেকটা দিল্লির চোখ দিয়ে বাংলার ইতিহাসকে দেখতে হয়। স্থানীয় সাহিত্যের বিকাশের ফলে এই অভাব কিছুটা দূর হলেও, সম্পূর্ণ ইতিহাস রচনার জন্য তা পর্যাপ্ত নয়। তাই জায়গায় জায়গায় এ যুগের ইতিহাসেও রয়েছে অস্পষ্টতা। লিপি প্রমাণ বা মুদ্রার সাক্ষ্যে এই অস্পষ্টতা কিছুটা দূর হলেও, একেবারে কাটেনি।

সারসংক্ষেপ

প্রাচীন ভারতের ন্যায় বাংলার ইতিহাস পুনর্গঠনও কষ্টসাধ্য। এর প্রধান কারণ উপাদানের স্বল্পতা। প্রাচীন বাংলার ইতিহাস প্রত্নতাত্ত্বিক উৎসের ওপর অধিকতর নির্ভরশীল। গ্রন্থাকারে লিখিত উপাদান যেটুকু আছে তা একান্তই অপর্যাপ্ত এবং ধর্ম-সামাজিক ভিত্তিক। তাই গ্রন্থাকারে লিখিত উৎসের ওপর নির্ভরশীল হলে প্রাচীন বাংলার ইতিহাস খুব কমই জানা যেতো। এ জাতীয় উৎসের মধ্যে 'রামচরিতম্' বিখ্যাত। দ্ব্যর্থবোধক এ কাব্যগ্রন্থটিতে পাল ইতিহাসের অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য বিধৃত রয়েছে। গ্রিক ও লাতিন লেখনি, চৈনিক বর্ণনা এবং আরব ভৌগোলিক ও বণিকদের বিবরণও প্রাচীন বাংলার ইতিহাসের ওপর উল্লেখযোগ্যভাবে আলোকপাত করে। এসকল বিদেশীর বিবরণে বাংলার অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির চিত্র ধরা পড়েছে। প্রত্নতাত্ত্বিক উৎসের মধ্যে তাম্রশাসনই বাংলার ইতিহাসের প্রধান অবলম্বন। এছাড়া মুদ্রা, ধ্বংসাবশেষ, শিলালিপি ইত্যাদিও বিশ্বস্তভাবে তথ্য সরবরাহ করে। মুসলমান শাসকদের পৃষ্ঠপোষকতায় সুলতানি আমলে 'ইতিহাস' রচনার প্রয়াস লক্ষ করা যায়। মূলত দিল্লিকেন্দ্রিক এসকল রচনার মধ্যে তাবাকাৎ-ই-নাসিরি, তারিখ-ই-ফিরোজশাহী, কিরান-উস-সাদাইন ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। নানাবিধ সীমাবদ্ধতা সত্বেও এ সকল রচনা থেকে বাংলার সুলতানি আমলের উৎস সম্পর্কে অনেক তথ্য পাওয়া যায়। এছাড়া মুদ্রা, লিপিমালা ও বিদেশীদের বিবরণেও গুরুত্বপূর্ণ তথ্য রয়েছে। স্থানীয় সাহিত্য থেকেও আর্থ-সামাজিক ও ধর্মীয় জীবনের তথ্য মেলে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। 'অর্থশাস্ত্র' রচয়িতার নাম কি?
(ক) মেগাস্থিনিস (খ) বাণভট্ট
(গ) আনন্দভট্ট (ঘ) কৌটিল্য।

২। সন্ধ্যাকর নন্দী রচিত কাব্যের নাম কি?
(ক) ইন্ডিকা (খ) হর্ষচরিত
(গ) রামচরিত (ঘ) বল□ালচরিত।

৩। 'সদুক্তিকর্ণামৃত' কাব্যের সংকলক কে?
(ক) শ্রীধর দাস (খ) বিদ্যাকর
(গ) গোবর্ধন (ঘ) শরণ।

৪। বাংলায় প্রাপ্ত প্রাচীনতম লিপি-প্রমাণ কোনটি?
(ক) খালিমপুর লিপি (খ) বাদল লিপি
(গ) দামোদরপুর লিপি (ঘ) মহাস্থান ব্রাহ্মী লিপি।

৫। 'ওয়ারি বটেশ্বর' প্রত্নস্থল কোথায় অবস্থিত?
(ক) রাজশাহী জেলায় (খ) নরসিংদী জেলায়
(গ) কুমিল্লা জেলায় (ঘ) ঢাকা জেলায়।

৬। 'রক্তমৃত্তিকা বিহার' কোথায় পাওয়া গেছে?
(ক) রাঙ্গামাটিতে (খ) রাজবাড়ীডাঙ্গায়
(গ) লালমাই পাহাড়ে (ঘ) ময়নামতিতে।

৭। আমীর খসরু রচিত গ্রন্থের নাম কি?
(ক) কিরান-উস-সাদাইন (খ) তাবাকাৎ-ই-নাসিরি
(গ) তারিখ-ই-ফিরোজশাহী (ঘ) তাজুল মাসির।

৮। 'রিয়াজ-উস-সালাতীন' রচয়িতা কে?
(ক) মিনহাজ-উস-সিরাজ (খ) জিয়াউদ্দিন বারাণী
(গ) গোলাম হোসেন সলিম (ঘ) শামস্-ই-সিরাজ আফীফ।

৯। কোন পর্যটক হযরত শাহজালাল (রাঃ) সম্পর্কে তথ্য দিয়েছেন?

(ক) মা-হুয়ান (খ) ইবনে বতুতা
(গ) সোলায়মান (ঘ) আল-ইদ্রিসী।

১০। টোমে পিরেজের বিবরণে কোন সময়ের তথ্য পাওয়া যায়?
(ক) ত্রয়োদশ শতাব্দীর (খ) চতুর্দশ শতাব্দীর
(গ) পঞ্চদশ শতাব্দীর (ঘ) ষোড়শ শতাব্দীর।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ঃ

১। প্রাচীন বাংলার ইতিহাস পুনর্গঠনের উৎস হিসেবে মুদ্রার গুরুত্ব বর্ণনা করুন।
২। পশ্চিমবাংলার প্রত্নস্থলসমূহের বিবরণ দিন।
৩। সুলতানি যুগে বাংলা সাহিত্যের বিকাশের কারণ নির্ণয় করুন।

রচনামূলক প্রশ্ন

১। প্রাচীন বাংলার ইতিহাস পুনর্গঠনের ক্ষেত্রে গ্রন্থাকারে লিখিত উৎসের গুরুত্ব নিরূপণ করুন।
২। প্রাচীন যুগে বাংলার ইতিহাস পুনর্গঠনের উৎসসমূহ পর্যালোচনা করুন। এ সকল উৎসের সীমাবদ্ধতা চিহ্নিত করুন।
৩। সুলতানি যুগে বাংলার ইতিহাসে বিদ্যমান উৎসগুলোর গুরুত্ব ও সীমাবদ্ধতা মূল্যায়ন করুন।
৪। দিল্লিতে রচিত গ্রন্থের ভিত্তিতে বাংলার ইতিহাস পুনর্গঠনের ক্ষেত্রে কি ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়? এক্ষেত্রে বিদেশীদের বর্ণনা কিভাবে সাহায্য করতে পারে?

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

১। R.C. Majumdar, *History of Ancient Bengal.*
২। Shahanara Husain, *Everyday Life in the Pala Empire.*
৩। আবদুল করিম, *বাংলার ইতিহাস (সুলতানী আমল)*
৪। আবদুর রহিম, *বাংলার মুসলমানদের সামাজিক-সাংস্কৃতিক ইতিহাস।*

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নের উত্তর ঃ

পাঠ : ১ ঃ ১। (গ) ; ২। (ক) ; ৩। (ঘ) ; ৪। (ক) ; ৫। (ক) ; ৬। (গ) ; ৭। (খ) ; ৮। (ক)।
পাঠ : ২ ঃ ১। (গ) ; ২। (ক) ; ৩। (গ) ; ৪। (গ) ; ৫। (গ) ; ৬। (গ)।
পাঠ : ৩ ঃ ১। (ক) ; ২। (ঘ) ; ৩। (গ) ; ৪। (গ) ; ৫। (গ)।
পাঠ : ৪ ঃ ১। (ঘ) ; ২। (গ) ; ৩। (ক) ; ৪। (ঘ) ; ৫। (খ) ; ৬। (খ) ; ৭। (ক) ; ৮। (গ) ; ৯। (খ) ; ১০। (গ)।